ব্যাবিলন কথকতা

চতুর্থ সংখ্যা

১৬ই ডিসেম্বর ২০০৯

ব্যাবিলন গ্রুপ

সম্পাদক:
এমদাদুল ইসলাম

আহবায়ক:
মুহাম্মদ সাইফুল হক

প্রচ্ছদ ও অলংকরন:
মুকুল মন্ডল

সার্বিক শিল্প নির্দেশনায়:
স্বাধীন খান
মোস্তফা কামাল

সহযোগিতায়:
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণে:
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৫৫২৩৭৪৫৮৪

সূচীপত্র

শুভেচ্ছা বক্তব্য		২
সম্পাদকীয়		৩
স্মৃতি	মোঃ শাহ আলম	৫
আমার পেশা, আমার গর্ব	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৭
আমাদের দেশের নারী বৈষম্য	উম্মে সালমা ডালিয়া	১০
কৌতুক	মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন	১১
রক্তের ঋণ	মোঃ হুমায়ুন খাঁন	১২
দুর্গন্ধ	তানজিলুল ইসলাম (সজীব)	১২
মেঘের মেয়ে বৃষ্টি	মোঃ নুর আলম	১২
আকাশে আমার ঘুড়ি	মোঃ জুয়েল রানা	১৩
সিগারেট	রোকনুল আমিন রোকন	১৩
শীতের পিঠা	মোঃ জাকির হোসেন	১৩
বৃষ্টির প্রত্যাশা	এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী	১৪
বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্পের সমস্যা এবং সম্ভাবনা	মাহবুব আল মামুন বিপ্লব	১৭
অনীল দিগন্ত	মোঃ জোবায়দুল ইসলাম	২০
খুঁজেছি তোমাকে	ইশরাত জাহান ইভা	২১
রক্তের দাম	মোঃ সাইফুল ইসলাম	২১
সোনার দেশ	মোঃ মফিজুর রহমান	২১
আকাশ নীলে	জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা	২২
স্বপ্ন প্রেমিক	মোঃ কাওছার	২২
বন্ধু রাজীব এবং তাঁর ভ্রমনবৃত্তান্ত	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	২৩
নির্বান	শামীমুল ইসলাম	২৬
RMG in Bangladesh - Management	Mohammad Hasan	৩০
A Sweet Memory That Still Chymes	Sohely Suraiya Sadeque	৩৩
ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি		৩৫-৩৬

শুভেচ্ছা বক্তব্য

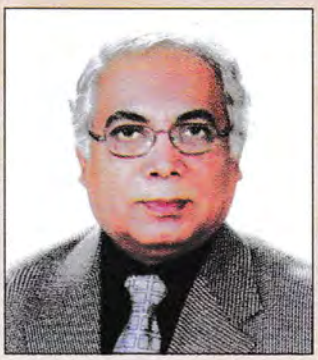

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প জগতে ব্যাবিলন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তৈরী পোশাক শিল্প হাজার হাজার মানুষ বিশেষ করে নারীদের জন্য কর্মজগতের যে দ্বার উন্মোচন করেছে তাতে ব্যাবিলন গ্রুপের অবদান অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের সৃজনশীলতার সন্ধান ও বিকাশেও গ্রুপটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ রকমই একটি প্রচেষ্টা হলো "ব্যাবিলন কথকতা" নামের বার্ষিক প্রকাশনা।

সাধারণভাবে তৈরী পোশাক শিল্প সম্পর্কে ইতিবাচক আলোচনার পাশাপাশি নানা রকম নেতিবাচক আলোচনাও সমাজে চালু আছে। বিশেষ করে শ্রমিকদের কম মজুরী প্রদান অথবা সময়মত মজুরী না দেয়ার আলোচনা প্রায়ই শোনা যায়। মজুরী নিয়েই যখন নানা কথা শোনা যায়, তখন শ্রমিকদের বিনোদন বিষয়টি অনেক দুরের ব্যাপার। কিন্তু বিনোদন থেকেও আরও অগ্রবর্তী চিন্তা ও কাজের প্রতিফলন হলো মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ, চর্চা ও তার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি। এই সৃজনশীলতার চর্চা কোন বুদ্ধিজীবী মহলে নয়, কোন উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নয়। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাবিলন গ্রুপের এই চর্চা অতি অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী ও সাহসী উদ্যোগ।

ব্যাবিলন গ্রুপ তার শ্রমিক, কর্মচারীদের সমন্বয়ে সৃজনশীল মেধার বিকাশে যে মহতী উদ্যোগ নিয়েছে তার নাম "ব্যাবিলন কথকতা"। ব্যাবিলন কথকতা শ্রমিক, কর্মচারী, কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকাশিত একটি বার্ষিক পত্রিকা। ব্যাবিলন কথকতার ৩টি সংখ্যা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সাধারণভাবে একটি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে এরকম একটি উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশ আমাদের দেশে বিরল দৃষ্টান্ত। এখানে লিখেছেন অপারেটর, মেশিনম্যান, ম্যানেজার, এমনকি ব্যাবিলনের পরিচালকবৃন্দ।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার প্রাথমিক স্তর শেষ না করতেই দারিদ্র পীড়িত তরুণ-তরুণীরা কাজ নেয় পোশাক শিল্পে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের যে প্রতিফলন আমি তাদের লেখাগুলিতে পেয়েছি, অনেক পরিচিত ও প্রচারিত পত্রিকাতেও অনেক সময় তা পাওয়া যায় না। লেখার মান, পত্রিকার সম্পাদনা, পত্রিকার প্রচ্ছদ এবং সার্বিক উপস্থাপনার মধ্যে এক সরল সৌন্দর্য, সৃষ্টিশীলতার সাক্ষর রয়েছে। লেখাগুলিতে যদি নাম বা পরিচিতি না থাকতো তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যেত না যে, একজন খুবই কম শিক্ষিত শ্রমিক এটা লিখেছেন। এখানে হয়তো বা সম্পাদনার মুন্সীয়ানা রয়েছে। কিন্তু মানুষের সৃজনশীলতার সাক্ষর লেখাগুলি বহন করে।

এবারেও বিজয় দিবসে ব্যাবিলন কথকতা'র চতুর্থ সংখ্যা বের হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবং আমার কয়েকটি কথা এই পত্রিকায় জায়গা পাবে জেনে আমি ব্যাবিলন কথকতা সম্পাদনা পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ড: আকা ফিরোজ আহমদ
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদকীয়

গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বিশ্ব মন্দার কথা বলেছিলাম। এক বছর পর এই কলামটি যখন লিখছি তখন মন্দা কেটে যাচ্ছে। তবে তার অপস্রিয়মান ছায়াটি মিলিয়ে যায়নি এখনো। তা সত্বেও এটা সুখের কথা – আশার কথা।

মন্দা কেটেছে যেন "ব্যাবিলন কথকতা"-র ও। এই প্রথম আমরা অনুভব করেছি পত্রিকার পাতার সংখ্যা যেন যথেষ্ট নয়। লেখক-লেখিকার সংখ্যার সাথে সাথে লেখার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাতা উল্টালেই প্রমাণ মিলবে তার।

মন্দা মোকাবেলায় ব্যাবিলনকে আঁচ মুক্ত রাখতে এই পরিবারের সবাইকে বাড়তি কিছু করতে হয়েছে বছরটিতে। এতে করে আমাদের সবার সার্বিক উন্নতি হয়েছে কারণ ব্যাবসায়ের অধঃগতি আমরা ঠেকিয়ে দিতে পেরেছি অনেকটাই। অনেক অদেখা, অজানা সমরে আমরা যুদ্ধ করেছি, জয়ী হয়েছি। নতুন নতুন কৌশল রপ্ত করেছি। এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় ব্যাবিলনিয়ানদের সামনে কোন বাঁধাই যেন আর বাঁধা হবেনা। সব চ্যালেঞ্জই তারা জয় করবে। ব্যাবিলনের সকল শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাকে আমার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ পাওনা থাকে আরো অনেকেরই। সবার উল্লেখ এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রেতা কূল, তাদের দেশীয় প্রতিনিধিগণ, আমাদের কাঁচামাল জোগানদাতারা, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ- এরা যেন বৃহত্তর ব্যাবিলন পরিবার ভূক্ত। এদের ব্যতিক্রমি সহযোগিতা আমাদের চলার পথকে সবসময় সুগম রেখেছে- বৃদ্ধি করেছে আমাদের অগ্রযাত্রার গতি। তাদের সবার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

ব্যাবিলন গ্রুপের সামান্য প্রচেষ্টা গুলোকে অসামান্য করে তুলে ধরার ব্যাপারে যাদেরকে সর্বত কাছে পাই তারা হল BGMEA, BKMEA ও BTMA-এর মত শীর্ষ প্রতিষ্ঠান সমূহ। এদের চলমান পৃষ্ঠপোষকতা আমাদেরকে ভাল কাজ ধরে রাখা ও তার ক্রম বিকাশে সদা উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এদেরকেও।

"ব্যাবিলন কথকতা"-এর পাঠক-পাঠিকারা জেনে উৎসাহিত হবেন যে, এবার স্বনামধন্য বৃহৎ আন্তর্জাতিক ক্রেতা H & M তাদের সাপ্লায়ারদের উল্লেখযোগ্য ভাল কাজের সুকির্তীর জন্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ব্যাবিলন গ্রুপের "ব্যাবিলন কথকতা" প্রকাশের বিষয়টি উল্লেখ করেছে আমাদের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে।

এছাড়া প্রখ্যাত ব্রিটিশ রিটেইলার TESCO আমাদের প্রতিষ্ঠান অবনী নিটওয়্যার লিঃ-কে সনদ দিয়ে সম্মানিত করেছে সেরা কাজের জন্য। অবনী নিটওয়্যার-এর শিশু-যত্ন কেন্দ্রটিকে TV, DVD Player ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে দেবার জন্য TESCO কে আমাদের অকুন্ঠ ধন্যবাদ।

ফরাসী ক্রেতা JULES- ও অবনী নিটওয়্যার-কে তাদের বর্ষ সেরা সাপ্লায়ারের সনদ দিয়ে সম্মানিত করেছে এবার। আশা করি এসব স্বীকৃতি অবনীর সার্বিক মানোন্নয়নের প্রয়াসকে আরো বেগবান করবে।

বায়ারদের বাইরেও গার্মেন্টস শ্রমিকদের একটি সুপরিচিত সংগঠন 'আওয়াজ ফাউন্ডেশন' ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ কে Industrial Relation's Award-2009 প্রদান করেছে মে' দিবসে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিতে ব্যাবিলন গ্রুপের সচেতনতা নতুন কিছু নয়। এ বিষয়ে প্রকাশ্যে-অলখ্যে অনেক

কিছুই করেছি আমরা-করছিও। এই দায়বদ্ধতার শেষ নেই তাই বলে । সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে তাই আমাদের করণীয়ও থেমে নেই। ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উচ্চমানে কৃতকার্য গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ২৮ জনকে বৃত্তি প্রদান করেছে, যাতে এই সব ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত ও সহজ হয়।

হেমায়েতপুরস্থ 'ব্যাবিলন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র' সন্ধানীর সহযোগিতায় নিজেদের ভিতর থেকে রক্তদান কর্মসূচীর এক সফল রূপদান করেছে এবছরই। প্রায় ১৪০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন সেই অনুষ্ঠানে যা কিনা বিপন্ন গরীব রোগীদের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দান করা হয়।

"ব্যাবিলন কথকতা"-য় এবার কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন অনুষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ আকা ফিরোজ আহমদ একটি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন এই পত্রিকার সকল লেখক, পাঠক ও কুশিলবদের উদ্দেশ্যে। ডঃ ফিরোজের সুন্দর বিশ্লেষন, অনুধাবন ও অকপট প্রশংসা (মহোত্তদ্দেশ্যে কিছু অতিরঞ্জন সহ) আমাদের সবাইকে দারুনভাবে উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই। তাঁকে আমাদের অন্তর নিঃসৃত ধন্যবাদ।

আরেকটি বৈচিত্র স্থান পেয়েছে এবারের সংখ্যায়। ইংরেজী ভাষার দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবার। ইংরেজীর মত একটি অপরিহার্য ও দরকারী ভাষা মাধ্যমে লিখতে উৎসাহ প্রদানই এর মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতে ইংরেজী বিভাগটি আরো পুষ্ট হবে, সমৃদ্ধ হবে এমনটা আশা করি (We have made space available for contribution in English from our writers in this issue of the magazine. This is to encourage them to hone their skill of writing in English. English is too important a language medium for us to ignore. I hope and believe this attempt of ours would be viewed positively by our readers and the authors would be encouraged to participate more in quantity and quality in future)।

পরিশেষে আমি ম্যাগাজিন কমিটির সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বলাই বাহুল্য এদের প্রচেষ্টায় অদম্য আগ্রহ ও হার না মানার মনোভাবটি না থাকলে এই সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ আপনাদের হতো না। নেপথ্যে অন্য সবার সাথে বিশেষ ধন্যবাদ দেব হেড অফিসের সোহেলীকে ও Trendz-এর ডিজাইনার মুকুলকে। মুকুল প্রচ্ছদটি করেছে- আর করেছে ভিতরের অলঙ্করণ। আশা করি এই ব্যতিক্রমটি সবার প্রশংসা কুড়াবে।

"ব্যাবিলন কথকতা"-এর সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, আমাদের সকল পরিচালকবৃন্দ সবাইকে রাশি রাশি ধন্যবাদ। এদের সমর্থন-সহযোগীতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিশ্রমের ফসল এই পত্রিকা ও তার পথ চলা।

আসন্ন বিজয় দিবস ও ইংরেজী নববর্ষ ২০১০-এর আগাম শুভেচ্ছা।

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ

তারিখ ঃ ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৯

স্মৃতি

মোঃ শাহ আলম
ম্যানেজার, এইচ. আর. এন্ড কমপ্লায়েন্স

তিতাসের এই বাঁকটাতে এলেই স্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়। তিতাসের মহুয়ার বাঁক! স্মৃতির সাথে শেষ কথা হয়েছিল এখানেই। এখন শুধু স্মৃতিটুকুই বাকী। বাইশ বছর আগের জলজ প্রকৃতি একটুকুও বদলায়নি। মাথা সমান উঁচু কাঁশবন, কাঁশবনের প্রান্তে নদীর বুকে জেগে উঠা চর পৃথিবীতে ঢের দিন ধরে একই রূপে বেঁচে আছে। রূপালী অথই জল এখানে তার আদি রূপ আর তন্বী লাবন্য নিয়ে শতত বহমান। উজানের সিমেন্ট কল, নতুন গজানো যিঞ্জি চামড়ার কারখানা, ডাইং মিল আর অসংখ্য ইন্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশনের দুষিত নিঃসরণ কি মহান মহিমায় আর কি অসম্ভব কৌশলে মহুয়ার বাঁকে এসে বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, তার রহস্য আমাকে নির্বাক করে দেয়। স্মৃতির শেষ চোখের জলটুকু বোধ হয় এখানে এসে আটকে আছে।

বহু দিন পর গাঁয়ের দিকে নাস্তা করছি। গাঁয়ে ফেরার পরিকল্পনাটা অবশ্য একবারেই আকস্মিক। বলা যায় এই কিছুক্ষণ আগের সিদ্ধান্ত। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সোজা সায়েদাবাদ এসে বাস ধরলাম। ঢাকার মানুষ যখন অফিসে যাওয়ার জন্য টাইয়ের নট ঠিক করতে ব্যস্ত, স্কুলগামী ছেলে-মেয়েগুলো যখন একগাদা বই ব্যাগের মধ্যে ভরে পিঠে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ছে কিংবা আমার অফিসের তাহেরা ম্যাডাম যখন তার ঠোঁটে লিপিস্টিকের শেষ প্রলেপ দিচ্ছে আমি তখন বহরমপুরের টং হোটেলের কাঠের বেঞ্চিতে বসে মহুয়ার বাঁকের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। চারটে পরটা, একটা ডাল ভাজি আর একটা মামলেট এর অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার সামনের টেবিলে ভুড়িওয়ালা দুই মানুষ খিচুড়ির মধ্যে পুরো হাতের কব্জি ডুবিয়ে বেশ কিছু কাঁচা মরিচ সহযোগে প্লেট চারেক সাবাড় করে পঞ্চম হাফ এর অর্ডার দিতেই একজনের মোবাইলে "বুকটা ফাইট্টা যায়" রিং টোন বেশ শব্দ করে বেজে ওঠে। মোবাইলটা কানে চেপে লোকটা বলে উঠলো-

- ভাইজান আমরা ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই আইতাছি । দুইজনই পঙ্গু হইয়া আইতাছি, আপনে কোন চিন্তা কইরেন না, আমরা পঙ্গু অইয়া ফিরুম। আসল ঘটনাটা তহনই কমু। আপনে কোন চিন্তা কইরেন না। আমাগো লাইগা দোয়া কইরেন।

ইতিমধ্যে আমার টেবিলে নাস্তা এসে গেছে । কিন্তু এই মোবাইল আলাপের আকস্মিক আত্মঘাতি শব্দগুলো আমার মাথার মধ্যে মহুয়ার চরের চির টলটলে জলের মতোই স্থির হয়ে আটকে যাচ্ছে। বেটা বলে কি? দুইজন ভালো মানুষ পঙ্গু হয়ে বাসায় যাবে? মানুষ ভালো হয়ে বাসায় ফিরতে চায়। আর এরা.....

আমি আমার বিস্ময় আর ভয় মেশানো কৌতুহল চেপে রাখতে পারলাম না। আমার টেবিল থেকে আরো একটু পিছিয়ে গিয়ে বেশ জড়োসড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করলাম-

- বড় ভাই কিছু মনে করবেন না....., এই আপনি মোবাইলে বলছিলেন যে, পঙ্গু হয়ে বাসায় ফিরবেন....., আমি ঠিক.....। লোকটা তখন খাওয়া-টাওয়া রেখে টেবিল চাপড়িয়ে হো হো করে অট্টহাসি দিয়ে বলে উঠলো-

- ও ভাই, আপনে বুঝতে পারেন নাই..... আমরা, মানে আমার শালা, কাইল রাইতে একসিডিন কইরা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হইছে, হো হো হো.....

লোকটার আর আমার গগণ ঝংকার করা মহা অট্টহাসিতে তিতাসের জল পর্যন্ত কলকল করে উঠলো। দীর্ঘ পাঁচ মিনিটের হাসাহাসির পর একটু দম নিয়ে বেসিনে মুখ আর চোখটা ধুয়ে আমি নাস্তার টেবিলে মনোযোগ দিলাম। পঙ্গু হইয়া আইত্যাছি-কথাটা আমার মাথায় মহুয়ার চরের বদ্ধ জলের মতোই আটকে রইল।

টং হোটেলে নাস্তা সেরে মহুয়ার চরের দিকে পা বাড়ালাম। স্মৃতির সাথে বাঁকের যে জায়গায়টায় শেষ কথা হয়েছিলো, কাঁশফুলে শোভিত সেই বৃন্দাবনে আরেকবার কিছুক্ষণ রোমন্থন শেষে তারপর গ্রামের দিকে ফিরবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

এই সেই মহুয়ার চর । আমার গা শিরশির করে উঠে । আমার জন্ম জন্মান্তর উদ্বেলিত হয় । আমার সমস্ত সত্তা আন্দোলিত হয় । হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাই! একজন ভিনদেশী লোক চিৎকার করে উঠে- Snake, Snake, Poisonous Snake! তার সাথে একজন বাঙ্গালী। বাঙ্গালী বেটাও সমান চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো No fear, No fear, Water Snake sir, Zero power । আমি তাকিয়ে দেখি একটা জল বোড়া (ঢোঁড়া) সাপ পানি থেকে উঠে কাঁশবনের দিকে যাচ্ছে। আমার আবারো অট্টহাসি পায়। আমি আস্তে আস্তে সেই জায়গাটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। রূপালী জলের সেই বৃন্দাবনের দিকে.....।

আমার পেশা, আমার গর্ব

মুহাম্মদ সাইফুল হক
ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজিং এন্ড মার্কেটিং, ওভেন টপ্স

দিনটা হল পহেলা জুন – লিখতে বসা আজকের এই তারিখের প্রতীক্ষায় ছিলাম যেদিন থেকে 'ব্যাবিলন কথকতা' চতুর্থ সংখ্যার লেখা আহ্বান চলছে। ভাবতে পারেন – লেখার জন্য দিনের প্রতীক্ষা এমন তো শুনিনি কখনও। আসলে এই বিশেষ দিনে আমার কলম দিয়ে গড় গড় কথা বেরিয়ে পড়বে তা নয়। বরং এটি আমার পেশা জীবনের শুরুর দিন। তাই প্রতিবছরই আমি এই দিনটাকে স্মরণে রাখি। ভাল লাগে, একটু গর্বও বোধ হয়, যখন একেকটি বছর অতিক্রান্ত হয়।

আজ আমার পেশা জীবনের এক দশক পূর্তি। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি পেশায় ঢুকে এক দশক অতিক্রম করার বিষয়টাকে আমি কখনও ছোট করে দেখি না। কাজেই এই পেশার একটু বর্ণনা 'ব্যাবিলন কথকতা'য় তুলে ধরার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। এতক্ষন যে পেশার কথা বললাম সেই পেশার নামটিই এখনও বলা হয়নি – তা হলো মার্চেন্ডাইজিং। 'মার্চেন্ডাইজ' একটি ইংরেজী শব্দ – যার সাধারণ অর্থ পণ্য ও তার ক্রয়-বিক্রয়। প্রচলিত অর্থে মার্চেন্ডাইজিং হলো ক্রেতার চাহিদা মত কোন পণ্য সঠিক মূল্যে যথাযথ গুণগতমান নিশ্চিত করে সময়মত রপ্তানী করণ। পোশাক শিল্পের ব্যবসায় যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থাকেন অর্থাৎ ক্রেতার চাহিদা জানা থেকে শুরু করে তা সম্পূর্নরূপে পূরণ করা পর্যন্ত দায়িত্বরত থাকেন তাদেরকে বলা হয় মার্চেন্ডাইজার।

পোশাক শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিভাগ বা ব্যক্তিবর্গের সাথে একজন মার্চেন্ডাইজারকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়, নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো ঃ

১) ক্রেতা বা বায়ার – ইউরোপ, আমেরিকা বা বিশ্বের কোন উন্নত দেশের বিভিন্ন পোষাক বিক্রির প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বায়ার বলা হয়।

২) কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা সাপ্লাইয়ার – অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড, চায়না, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, ভারত ইত্যাদি দেশের বড় কাপড়ের মিল ও এক্সেসরিজ তৈরীর প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বাংলাদেশেও এক্সেসরিজ তৈরীর বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। এছাড়া এদেশে কয়েকটি কাপড় তৈরীর আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন মিলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩) কারখানা বা ফ্যাক্টরী – বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার পোষাক তৈরীর কারখানা রয়েছে। প্রতিটি কারখানায় রয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা বিভাগ। যেমন –

ক) স্যাম্পল ডিপার্টমেন্ট
খ) কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট
গ) প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট
ঘ) স্টোর ও ইনভেন্টরী ডিপার্টমেন্ট
ঙ) কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট
চ) কমপ্লায়্যান্স ডিপার্টমেন্ট
ছ) প্রিন্টস্, এমব্রয়ডারী, ওয়াশিং ইত্যাদি

৪) সিএন্ডএফ – পণ্য আমদানী বা রপ্তানীতে সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

উপরে উল্লিখিত প্রতিটি বিভাগ বা ব্যক্তিবর্গের সাথে একজন মার্চেন্ডাইজারকে সার্বক্ষণিক সমন্বয় করে চলতে হয় যাতে

সময়মত কাঙ্খিত গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ক্রেতার হাতে পৌঁছে। এই কাজটি যথার্থভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহকরণে অত্যন্ত দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। মার্চেন্ডাইজারের কাঙ্খিত দায়িত্ব পালনে যেসব যোগাযোগ যন্ত্র ও সেবা প্রতিষ্ঠান সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতে হয় তা হলো –

১) ফোন – (ক) ল্যান্ড ফোন (খ) মোবাইল ফোন
২) কম্পিউটার – (ক) ডেস্কটপ (খ) ল্যাপটপ (গ) পামটপ
৩) ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন সিস্টেম – (ক) ই-মেইল (খ) ইন্টারনেট (গ) ভিডিও কনফারেন্স
৪) ফ্যাক্স
৫) ডিজিটাল ক্যামেরা
৬) স্ক্যানার ইত্যাদি।

একজন দক্ষ মার্চেন্ডাইজারের কতগুলো গুণ থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় এ গুণগুলোর অন্যতম প্রধান হলো তার কমিউনিকেশন স্কিল তথা যোগাযোগ দক্ষতা। যা কিনা মাতৃভাষা বাংলা ও আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী দুটোতেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। এ ছাড়া আরো দরকার–

* কো-অর্ডিনেশন স্কিল বা সমন্বয় দক্ষতা।
* নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা
* সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা
* মার্চেন্ডাইজিং পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্ম্পকে সম্যক ধারণা
* মার্কেটিং নলেজ ও মূল্য নিরুপনের দক্ষতা
* প্রচন্ড চাপের মুখে কাজ করার ক্ষমতা
* সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের দক্ষতা
* কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা এবং
* তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ তথা হাউজকিপিং

উপরে উল্লিখিত গুণাবলীর কোন একটিও যদি কারও অভাব থাকে তবে তার পক্ষে মার্চেন্ডাইজিং কাজ সুচারুরূপে করা সম্ভব নয়।

আমার লেখাটির সম্ভাব্য পাঠক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বলতে চাই পেশাজীবি হিসেবে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিষ্টার, সরকারী কর্মকর্তা, ব্যাংকার ও শিক্ষকের সাথে সাথে মার্চেন্ডাইজারগণও দেশ ও জাতির জন্য বিশেষ ভুমিকা পালন করছেন। সারা দেশের মার্চেন্ডাইজাররা দেশের জন্য প্রায় দশ বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার অর্জন করে থাকেন বছরে পোষাক রপ্তানীর মাধ্যমে। যার বাংলাদেশী টাকায় মূল্যমান সত্তর হাজার কোটি টাকা। কাজেই আপনিও মার্চেন্ডাইজার হওয়ার স্বপ্নটা দেখতে পারেন ও ভাগীদার হতে পারেন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই গর্বের সাথে। আপনি যোগ্য হলে এই পেশা অবশ্যই আপনাকে সৎপথে পর্যাপ্ত অর্থ, বিদেশীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং বিদেশ দেখার আনন্দ প্রদান করবে।

বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশ বছরের পোষাক শিল্পের ইতিহাসে আজ অন্তত এক যুগ ধরেই মার্চেন্ডাইজিং পেশাটি শিক্ষিত, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যোগ্য লোকদের জন্য একটি নতুন সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন দেশের নামকরা ব্রান্ডেড রিটেইলারের লোকাল অফিস, বায়িং হাউজ, গ্রুপ অব কোম্পানীজ ও সারা বাংলাদেশের পোষাক কারখানা মিলে এই মার্চেন্ডাইজিং পেশায় সম্পৃক্ত আছেন প্রায় পনের থেকে বিশ হাজার শিক্ষিত ব্যক্তি। এঁরা বাংলাদেশের প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান, এই কারখানাগুলোর রপ্তানীকর্ম সুচারু রূপে সম্পাদনের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নতির শিখরে উঠতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। বাংলাদেশের পোষাক শিল্পকে বলা হয়

বাংলাদেশের অর্থনীতির এক শক্ত ভিত। সারা বিশ্বের চলমান মন্দাতেও বিশ্বের পোষাকশিল্প বাজারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী করতে মার্চেন্ডাইজারগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছেন।

গত আট বছর আগেও মার্চেন্ডাইজারদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন ডিগ্রী নেয়ার সুযোগ ছিল না। আর তাই সাধারনতঃ যারা অন্ততঃ ডিগ্রী পাশ এবং ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন, নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা আছে তারাই এই পেশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতটুকু যোগ্যতা আর যথেষ্ট নয় পোশাকশিল্প ভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার সুবাদে।

বাংলাদেশে মার্চেন্ডাইজিং ডিগ্রী দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো –

১। প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি। এখানে 'টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল মার্কেটিং' এর উপর এম.বি.এ. ডিগ্রী প্রদান করা হয়।
২। বি.আই.এফ.টি. – এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা হয়।
৩। শান্ত–মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। পার্ল ফ্যাশন ইন্সটিউটিউট, ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে প্রচুর ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

ব্যাবিলনের একজন সম্মানিত পরিচালককে বহুবার বলতে শুনেছি যদি কোন পেশায় পেশাজীবিদের হালাল রিজিকের জন্য সনদ প্রদান করা হত তাহলে বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের প্রতিটি কর্মী সেই সনদের অধিকারী হত। সে ক্ষেত্রে একজন মার্চেন্ডাইজারও এই গৌরবান্বিত সনদের অধিকারী। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কিছু মার্চেন্ডাইজার আর্থিক সুবিধার কারণে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছেন যা অবশ্যই পরিহার্য। এ রকম কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এদেশের প্রত্যেক মার্চেন্ডাইজার পোশাক শিল্পের অগ্রগতিতে যে অসামান্য ভুমিকা রেখে চলেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। ঘরে বসে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে মার্চেন্ডাইজারদের পেশাগত দক্ষতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশে অনেক বিদেশী ব্যক্তি মার্চেন্ডাইজিং এর সাথে যুক্ত এবং বেশ কিছু বিদেশী কোম্পানীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী একজন দেশী মার্চেন্ডাইজারের চেয়ে। অথচ এদেশের মার্চেন্ডাইজাররা তাদের পেশাগত দক্ষতা আর একটু বাড়াতে পারলে তাঁরাই এদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী কোম্পানী গুলোর নেতৃত্ব দিতে পারতেন। এতে করে আমাদের মর্যাদা বাড়ত এবং দেশে আরও অনেক শিক্ষিত যুবকের সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ করা যেতো। এ কথাও সত্যি আমাদের দেশের অনেক মার্চেন্ডাইজারের পণ্যের কারিগরি দিক, উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারনার অভাব রয়েছে। এ ছাড়াও কমিউনিকেশন ও নেগোশিয়েশন স্কিলেরও উন্নয়নের প্রয়োজন। এদেশের মার্চেন্ডাইজাররা অনেক পরিশ্রমী। তাদের শ্রমের সাথে জ্ঞানের সংযোগ হলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে আরও বেশী শক্তিশালী ও লাভজনক করা সম্ভব হবে।

পেশা জীবনের শুরুতে মার্চেন্ডাইজিং পেশা সম্পর্কে অজ্ঞানতা থাকায় দ্বিধায় থেকেছি, পরিচয় দিতে বেগ পেয়েছি। আজ সেই দ্বিধা পরিনত হয়েছে দৃঢ়তায়, বেগ পরিনত হয়েছে আবেগে – তাইতো উচ্চকণ্ঠে বলছি – "আমার পেশা, আমার গর্ব"।

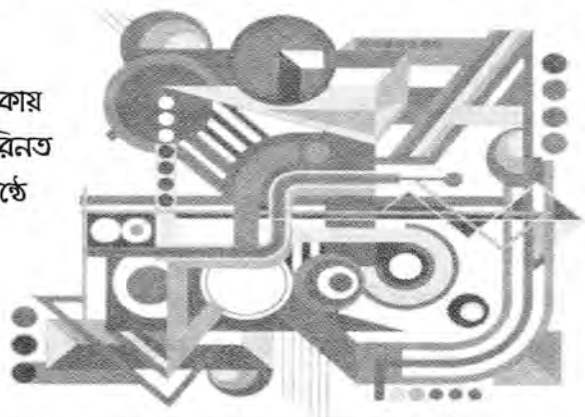

আমাদের দেশের নারী বৈষম্য

উম্মে সালমা ডালিয়া

ডেপুটি ম্যানেজার, প্যাটার্ন, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের সামাজিক অবস্থা এখনও অনেক নিচে। যদিও আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে অবস্থার। কিন্তু উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের দেশের মেয়েরা সামাজিক এবং পারিবারিক সুবিধা পায়না। প্রথমেই ধরি পরিবারের কথা, সেখানে কোন দম্পতির যদি প্রথম মেয়ে সন্তান হয় তবে তারা খুব একটা খুশি হয় না। আবার খুব অখুশিও হয় না। কিন্তু পরবর্তী সন্তান ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে খুবই অখুশি হয়। তবে পরপর দু'টি ছেলে হলে কেউই অখুশি হয় না। তাদের খাবার থেকে শুরু করে সব কিছুতেই বৈষম্য করা হয়। ছেলেদের খাবারের মান মেয়েদের থেকে উন্নত হয়। ছেলেদেরকে অপেক্ষাকৃত ভালো স্কুলে ভর্তি করানো হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত ভিন্ন। মেয়েরা শুধু পারিবারিক ভাবে নয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবেও বৈষম্যের শিকার। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বের মেয়েরা আমাদের দেশের মত বৈষম্যের শিকার হয় না।

আমাদের দেশে নারীদের পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রেরও বোঝা মনে করা হয়। অথচ জাতি গঠনে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। তার পরও নারীদের হেও মনে করা হয়। এই নারীরা এখন আর চার দেওয়ালের ভিতর বন্দি নয়। এরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন Challenging পেশায় কর্মরত। প্রকাশ্যে এদের প্রশংসা করলেও অন্তরালে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা করা হয়। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা এত অনুন্নত যে বাস্তবতাকে বিশ্বাস করতে চায় না। এই ভাবে বৈষম্য সমাজে বিরাজ করলে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন বাঁধা গ্রস্ত হবে।

তাই নারীদের ছোট করে দেখা চলবে না। তারাও মানুষ। তারাও উৎসাহ পেলে অনেক কিছু দিতে পারে দেশকে। বর্তমানে এমন কোন ক্ষেত্র বা মাধ্যম নেই যেখানে, নারীদের অংশগ্রহণ নেই। বৈমানিক থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার এবং রাজনীতিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তাহলে নারীদের ভিন্ন করে দেখা হয় কেন? আমাদের জাতীয় উন্নয়ণে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান অপরিসীম। এখানে মেয়েদের অংশ গ্রহণ ব্যাপক দেখা যায়। একটি নারী, একজন পুরুষের চেয়ে কাজ কম করে না। কিন্তু তাদের মূল্যায়ন সেভাবে করা হয় না, যেমনটা পুরুষের ক্ষেত্রে হয়।

প্রকৃতি প্রদত্ত ভাবেই নারীদের মনটা থাকে একটু নরম এবং শারিরীক সামর্থের দিক থেকেও একজন নারী একজন পুরুষের থেকে দুর্বল থাকে। আমাদের দেশে প্রায় সব অফিসেই নারী এবং পুরুষের মূল্যায়ন করা হয় ভিন্ন রকম, যদিও তারা উভয়ে সমমানের কাজ করে থাকে। কারন হিসেবে আমি মনে করি, নারীরা সাধারনত তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময় চিন্তিত থাকে। যদি সে কোন জায়গায় মোটামুটি একটা নিরাপত্তা পায় তাহলে সে আর সহজে সে চাকুরী ছাড়ার চিন্তা করে না এই সুযোগটাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে থাকে এবং তাকে আর সঠিকভাবে মুল্যায়ন করে না। কিন্তু একটি ছেলের নিরাপত্তা জনিত কোন সমস্যা নেই, সে সব সময়ই তার সুযোগ সুবিধাদি নিয়ে চিন্তা করে এবং সেটার কোন ঘাটতি থাকলে সাথে সাথেই চাকুরী পরিবর্তন করে ফেলে উন্নতির আশায়। এতে করে ছেলেটির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ চিন্তা করে তার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে দেয়ার, কারণ তা না হলে ছেলেটিকে হারাতে হবে। মেয়েরা যে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগে সেটাও আমাদের সমাজের ব্যর্থতা। কারণ যদি সরকার তথা রাষ্ট্র বা সমাজ মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে পারত তাহলে আমাদের দেশের মেয়েরা আরও এগিয়ে যেতে পারত। উন্নত বিশ্বে মেয়েদের অবস্থা আমাদের দেশ থেকে অনেক ভালো। তাই সে দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। উন্নত দেশে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেনা। তারা তাদের পরিবারেও সম-মর্যাদা পায় যার ফলে তারা মানষিক

ভাবে ভালো থাকে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

গার্মেন্টস শিল্প কারখানায় কখনো কখনো নাইট ডিউটি করতে হয়। এ ক্ষেত্রে যদি কোন ছেলে নাইট ডিউটি করে বাসায় ফিরে তবে তার বাসার সবাই বিশেষ করে তার স্ত্রী বা মা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার জন্য। কিন্তু যদি কোন নারী কর্মী নাইট ডিউটি করে বাসায় ফিরে সে ক্ষেত্রে রাস্তায় তো তার জন্য বিপদ অপেক্ষা করেই এবং বাড়িতেও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে উষ্ণ আন্তরিকতা পায় না। মেয়েরা যখন বাবার সংসারে থাকে তখন থেকেই তারা অবহেলিত থাকে। পরিবারের কোন গরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার সময়ও কোন মেয়ে সদস্যদের রাখা হয় না বা তাদের মতামত নেয়ার প্রয়োজন মনে করা হয় না। এরপর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলে স্বামীর ঘরেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেখানে কর্তার কথায়ই সব কিছু চলে। এরপর মেয়েটি যখন বার্ধক্যে চলে যায়, তখন ছেলে সন্তান তাঁর ভরণ-পোষনের দায়িত্ব নেয়। সে সন্তানও মাকে মূল্যায়ন করে না যেমনটা সে তার বাবার জন্য করে। সবচেয়ে যেটা দু:খের সেটা হল নারীরাই নারীদের বড় সমালোচক। একজন নারী যখন কোন পরিবারের বউ হিসাবে আসে, তখন সে প্রথম বাঁধার সম্মুখীন হয় তার শাশুড়ী বা ননদের কাছ থেকে। কিন্তু এই শাশুড়ী বা ননদ ভুলে যান যে তিনিও এক সময় বউ ছিলেন কিংবা বউ হবেন। আসলে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে এমনটাই হয়ে আসছে। অবশ্যই আগের চেয়ে এই অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আরও ব্যাপক উন্নতির প্রয়োজন। না হলে আমরা বর্তমান বিশ্বের চেয়ে উন্নয়নের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ব।

কৌতুক

সংগ্রহে ঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন
জুনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল, অবনী টেক্সটাইলস লিঃ

✲ শিক্ষক : রহিম বলতো রোম শহর কোন সময় তৈরী হয়েছিল?
ছাত্র : রাতে স্যার।
শিক্ষক : তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?
ছাত্র : কেন স্যার? একটু আগে আপনিইতো বললেন, Rome was not built in a day.

✲ জেলখানার বড় কর্মকর্তা : এখানকার আসামীগুলি খুব পাঁজি এবং খারাপ। আপনি এদেরকে কন্ট্রোল করতে পারবেন?
নতুন কর্মকর্তা : পরবোনা মানে অবশ্যই পারবো। যেইডা কতা না হনবো হেইডারে ঘার ধইরা বাইর কইরা দিমু স্যার।

✲ স্বামী : কি ব্যাপার কোথায় ছিলে তুমি? সেই কখন থেকে ষাঁড়ের মত চিৎকার করছি, আসতে দেরী হল কেন?
স্ত্রী : হবেনা! ষাঁড়ের ভাষা কি আমি বুঝি?

মেঘের মেয়ে বৃষ্টি

মোঃ নুর আলম
সিনিঃ অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

আকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়
কাল মেঘের পাল
বৃষ্টি নামলো
দৃষ্টি থামলো
নিরব মহা কাল।

গুরুম গুরুম ধুরুম ধুরুম
বজ্র পাতের হানা
গাছের ডালে টিনের চালে
বৃষ্টি পরে টানা।

টাপুর টুপুর বাজায় নূপুর
মেঘের মেয়ে বৃষ্টি,
ধরার বুকে মনের সুখে
জেগে উঠে সৃষ্টি।

রক্তের ঋণ

মোঃ হুমায়ুন খাঁন
সিনিয়র অফিসার, একাউন্টস এন্ড ফাইনান্স,
ট্রেন্ডজ

সুখ-স্বপ্ন নয়
স্বপ্ন-প্রত্যাশাকে জলাঞ্জলি দিয়েছি
মাতৃভূমির জন্য,
তবু আমি ধন্য।
আমার রক্তে মুক্ত স্বদেশ
মুক্ত সবার প্রাণ,
এই শপথে বিলিয়েছি লক্ষ তাজা প্রাণ।
রক্তে মুক্ত এই বঙ্গেতে
নেই আর কোন বাঁধা প্রাণ,
তোমরা স্বাধীন! মুক্ত পাখি।
এই আমাদের জন্য
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে
রক্ত করো ধন্য-স্বপ্নীল বাংলার জন্য।

দুর্গন্ধ

তানজিলুল ইসলাম (সজীব)
কিউ.সি., ব্যাবিলন ড্রেসেস লিঃ

হরতাল হলে সারাদেশ জুড়ে
আবহাওয়া থাকে বৈরী,
বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা
লাঠি - সোটা নিয়ে তৈরী।
মিছিল মিটিং, গাড়ি ভাংচুর
রাজপথ অবরুদ্ধ,
জনতা পুলিশে হাতাহাতি
আর চরমে ওঠে দ্বন্দ।
রাজনীতির এই নোংরা খেলায়
ছুটে শুধু দুর্গন্ধ।

আকাশে আমার ঘুড়ি

মোঃ জুয়েল রানা
সিনিয়র অপারেটর, সুইং, অবনী ফ্যাশন্স লিঃ

আকাশে উড়াই ঘুড়ি, ঘুড়ি খায় পাক
যেখানে ইচ্ছে তার, সেখানেই যাক।
কি আছে নীলের পারে, নীল নাকি সাদা
মেঘ কি তুলোর মতো পাহাড়ে বাঁধা ?
যেখানে ইচ্ছে যাক্, কোন বাঁধা নেই
নাটাই ঘুরিয়ে সুতো সব ছেড়ে দেই।
ঘুড়ির সঙ্গে ঘুড়ি বাঁধা পড়ে গেলে
হেলে দুলে নেচে যেন লুকোচুরি খেলে।
বাতাসে জলের ঘ্রান পাখি মেলে ডানা,
আকাশে আমার ঘুড়ি নাচে একটানা।
আরো দূরে বহুদূরে সামনে কি আছে
ঘুড়ি মোর উড়ে যেয়ে ঠিকানাটা যাঁচে।

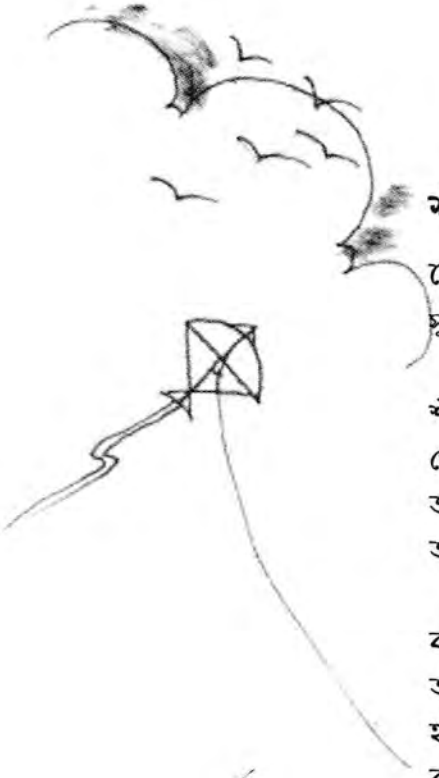

সিগারেট

রোকনুল আমিন রোকন
সুপারভাইজার, ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ

সিগারেট যদি খাও
তবে তোমারো
জীবন এক
জ্বলন্ত সিগারেট হবে।

তারচে ঐ টাকায়
কিনে খাও ফল,
রবে ভাল মনটা
দেহে পাবে বল ।

টাকা পয়সা ব্যয় করে
খেও নাকো ছাইপাশ,
দুষনমুক্ত রাখো
মানুষের চারপাশ।

শীতের পিঠা

মোঃ জাকির হোসেন
সুপারভাইজার, ব্যাবিলন আউটফিট লিঃ

শীত এসেছে শীতের পিঠা
খেতে হবে ভাই
তাইতো আমি ঢাকা ছেড়ে
আমার গাঁয়ে যাই।

বরিশালে গাজির পাড়ে
আমার প্রিয় গাঁ
হরেকরকম পিঠা নিয়ে
বসে আছেন মা।

ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা
আরও কতো পিঠা
শীত সকালে খেজুর রসে
মুখটি করি মিঠা।

মায়ের হাতে শীতের পিঠা
খেতে মজা ভারি
তাইতো আমি জলদি করে
যাচ্ছি গ্রামের বাড়ি।

বৃষ্টির প্রত্যাশা

এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল, ওজেন টপ্‌স

এক

সূর্য যতই উপরে উঠছে রিকশার গতি ততই কমে যাচ্ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে আকাশের টেনশনও বাড়ছে। ওর একটা সমস্যা হল, ছোট খাট ব্যাপারেও ও টেনসড্ হয়ে যায়।

– ভাই, একটু জোরে চালান। ট্রেনটা মিস্ করব তো !

– আমি তো মেশিন না ভাই, মানুষ। এই রোদ্রে এর চেয়ে জোরে কেমনে চালাবো ?

রিকশা ওয়ালার কথাটাও কিছুটা যুক্তিসংগত মনে হয় ওর কাছে। ষ্টেশনের বাইরে থেকেই ও ট্রেনের হুইসেল শুনতে পাচ্ছে। ওর অস্থিরতা আরও দুই গুন বাড়ল। রিকশায় বসেই ও ট্রেনের টিকিটটা পরখ করে নিল। রিকশা ষ্টেশনে পৌঁছতেই আকাশ ভাড়া চুকিয়ে ট্রেনের পেছনে ছুটল। ততক্ষনে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আকাশ পেছনে পেছনে দৌঁড়াতে থাকল। কাঁধের কফি কালারের ব্যাগটাকে এখন বেশ ভারি মনে হচ্ছে তার। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোন মতে একটা রিজার্ভড্ বগিতে উঠে পড়ল ও। কম্পার্টমেন্টে উঠে নিজেকে কোন মতে সামলে নিল তার পর ভেতরে তাকাতেই দেখল জানালার পাশে এক তরুণী বসে আছে। তার দৃষ্টিতে যেন বিরক্তি ঝরে পড়ছে।

– এই যে মিষ্টার, এটা রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্ট। এখানে উঠেছেন কেন ? নামুন!

মেঘ না চাইতে বৃষ্টির কথা শোনা যায় কিন্তু আকাশের কাছে মনে হচ্ছে এটা যেন মেঘ না চাইতেই ঝড়। অত্যন্ত ভদ্র কণ্ঠে সে বলল,

– দেখুন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। আমার কিছু করার ছিল না। চিটাগাং যাবার জন্য আজকের দিনে এটাই শেষ ট্রেন। তাই অনুমতি না নিয়েই উঠে পড়লাম।

– ভাল অজুহাত পেয়েছেন! নামুন বলছি !

– দেখুন চলন্ত ট্রেন থেকে কি করে নামা সম্ভব! বরং নেক্সট ষ্টেশনে নেমে আমি অন্য বগিতে চলে যাবো।

আকাশের কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয় তরুণীটি।

– আচ্ছা ঠিক আছে বসুন।

আকাশ গিয়ে সীটে বসে। মেয়েটাকে একবার দেখে নেয়। বয়স ২০-২২ এর বেশি হবে না। সালোয়ার কামিজ পরনে। চেহারাটা খুব চেনা চেনা। কিছুক্ষনের জন্য নীরব থাকে দুজনই। তার পর আকাশই প্রথম কথা বলে।

– আমরা কি পরিচিত হতে পারি না ?

তরুণী ভদ্রতার খাতিরে হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়ে ।

সংগে সংগে আকাশ তার নিজের পরিচয় দিয়ে যায় গড়গড় করে –

– আমার নাম আকাশ। পুরো নাম তাহসীন রহমান। বাবা মৃত মিজানুর রহমান। মা তাহমিনা আক্তার। পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রামে। ঢাকায় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে এ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছি।

আকাশের এক নিশ্বাসে কথা বলার অদ্ভুত ধরণ দেখে হেসে ফেলে তরুণীটি।

– এবার আপনার পালা ! আবদারের ভঙ্গিতে বলে আকাশ ।

– আমার নাম সানজিদা আক্তার সীমা। ঢাকা ভার্সিটিতে ম্যানেজমেন্টে অনার্স করছি। বাবা খলিল আহমেদ, গ্রামের চেয়ারম্যান। আমি ফুফুর বাসায় থেকে পড়াশুনা করি। হঠাৎ বাবার জরুরী তলব।

– দাঁড়ান, দাঁড়ান, সীমাকে থামিয়ে দেয় আকাশ। এখানে আপনার সাথে আমার মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা আপনার কি পার্সোনাল কোন ই-মেইল আই.ডি. আছে ?

– হ্যাঁ আছে।

– সেটা কি seema@yahoo.com ?

– হ্যাঁ।

- তাহলেতো মিলেই গেল, তাইতো বলি তোমাকে চেনা চেনা লাগছে কেন, তুমিই তাহলে সীমা !

ঘটনার আকস্মিকতায় সীমা হতভম্ব হয়ে যায়। আকাশ সহজ করে দেয়।

আরে... আমি আকাশ, akash@yahoo.com !

মুহূর্তেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় সীমার সামনে।

- তুমি আকাশ ? আশ্চর্য ! I can't believe my ears ! সেই ঘন্টার পর ঘন্টা chatting, jokes কি সুন্দর জোকস্‌গুলোই না তুমি বলতে।

সীমা খুব দ্রুত কথা বলতে লাগল।

- আর তুমিতো, কবিতা বলতে কথায় কথায়, তাইনা ? সেই যে....., যখন মুড অফ থাকে তখন সবই ফাঁকা লাগে, হা- হা- হা।

তার পর আবার ক্ষনকাল নীরবতা। নীরবতা ভাঙ্গল সীমা। তুমি দেখা করতে চেয়েও করোনি ! কেন ? কথাটাতে খানিকটা অভিমান মেশানো ছিল হয়তো।

- জানাটা কি খুব জরুরী ?
- হ্যাঁ।
- বিশ্বাস করবে ?
- করব।

- যে দিন তোমার সাথে দেখা করার কথা ছিল, সে দিন বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। চলে গেলাম দেশে।
- বাবার মৃত্যু, মাকে আর আমাকে একা করে দিল। কোন কারণ ছাড়াই সব বন্ধু বান্ধবের সাথে relation কাট-ছাট করে দিলাম। একটানে বলে গেলো আকাশ।
- আমি খুবই দুঃখিত। সীমা মৃদু স্বরে বলে।

পরিবেশ ভারী হয়ে যাচ্ছে বুঝে আকাশ বলে উঠল, বাদ দাও, একটা জোক শুনবে ?

- অবশ্যই ! এক সময় তোমার জোক না শুনলে আমারতো ঘুমই হত না। আনন্দের সুরে বলে সীমা।

আকাশ জোক শুরু করে ...

- এক teenager ছেলে তার সহপাঠীর সাথে দুঃখ শেয়ার করছে,
- জানিস! আমার বাবা-মা কেবলই বলে, পাশের বাসার সালমাকে দেখ, সব সময় কেমন পরীক্ষায় ভাল করে। দেখেছিস! ও কত পরিশ্রম করে ।
- দ্বিতীয় বন্ধু বলল, ঠিকইতো ! ওকে দেখে ওর মত একটু পড়লেই পারিস।
- প্রথম বন্ধু বিরক্ত হয়ে বলল, আরে দোস্ত তোদেরকে কিভাবে বলি, ওকে দেখার জন্য দিনরাত বারান্দায় বসে থাকি বলেই তো আমার পড়শুনাটা হচ্ছে না।

জোক শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে সীমা।

আকাশ মুগ্ধ হয়ে যায় ওকে দেখে। ওর মেইলে দেয়া ছবিগুলোর চেয়ে সীমা অনেক বেশি সুন্দর।

আকাশের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে খানিকটা লজ্জা পায় সীমা।

কথা বলতে বলতে ক্লান্ত আকাশ এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ওর চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। বেচারা, নিশ্চই অনেক ক্লান্ত। বাইরে ভীষন রোদ। তা সর্ষে ক্ষেতের উপর পড়াতে মনে হচ্ছে যেন সর্ষে ক্ষেতে আগুন ধরে গেছে। একটা অসম্ভব ভালোলাগা সীমাকে আচ্ছন্ন করে আছে। আচ্ছা, আকাশের মলিন মুখটা কি ওকে কোন অচেনা মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে ! কে জানে ! ও মনে মনে কবিতা আওড়ায় ...

চোখ পড়লে চোখের মায়ায়, মনটাও কি হারায় সাথে,
পথে পাওয়া ভালোলাগা, যায় কি আবার হারিয়ে পথে।

দুই

তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা মাথায় নিয়ে জ্ঞান ফিরে সীমার। অনেক কষ্টে উঠে বসে সে। ওর চোখের সামনে কেবল মানুষ ছুটছে আর চিৎকার করছে। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল ওর। ট্রেনটা যখন ব্রাহ্মনবাড়িয়া পার হয়ে আখাউড়ার পথে তখন তা লাইনচ্যুত হয়। সম্পূর্ণ ট্রেনটাই পড়ে যায় উঁচু জায়গা থেকে পাশের খাদে। সীমা উঠে বসে। কেউ হয়তো ওকে ট্রেনের বগি থেকে বের করে এনেছিল।

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ায় ও। পায়ের কাছটায় চামড়া অনেকখানি উঠে গেছে। সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই। সে আকাশকে খুঁজছে। বেশ কিছুক্ষন এদিক ওদিক হাঁটল ও। দুর্ঘটনায় মরে যাওয়া মানুষের লাশগুলো একটা সারি করে রাখা হচ্ছে। সারিতে লাশের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আহতদের লোকজন ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। সীমা ধীর পায়ে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া কম্পার্টমেন্টের ভেতর ভাল করে খুঁজে দেখল, লাশগুলোর মাঝে খুঁজল কিছুক্ষন, আহতদের মাঝেও খুঁজল সে, কিন্তু আকাশকে কোথাও দেখতে পেল না।

সীমার হৃদয়টা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কষ্টে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল ওর। কিছুক্ষনের মধ্যে রেলওয়ের উদ্ধারকর্মী দল এসে গেল। তারা আহতদের চিকিৎসা দেবার ব্যবস্থা করতে শুরু করল। লাশগুলোর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা। হয়তো আইনি তদন্তের পর সরাবে।

সীমা শেষ বারের মত আর একবার চারদিকে তাকাল। ওদের কম্পার্টমেন্টের জানালার কাছে ওর লাগেজটা দেখতে পেল। সেটা এক উদ্ধার কর্মীর সহায়তায় বের করে আনল। লাগেজটার সাথে আকাশের কফি কালারের হ্যান্ড ব্যাগটাও পাওয়া গেল। এর পর অনেক কষ্টে সীমা বাড়ি এসে পৌঁছল।

সীমার বাবা, খলিল সাহেব মেয়ের এমন অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। পরে মেয়ের কাছ থেকে সবিস্তারে দুর্ঘটনার বিবরন শুনলেন। সীমা আকাশের হ্যান্ডব্যাগটা খলিল সাহেবকে দেখালো। সেখানে আকাশের বিস্তারিত Information আর ছবি পাওয়া গেল। ছবিটা দেখে আঁতকে উঠলেন খলিল সাহেব। সবিস্ময়ে তিনি বলে উঠলেন, একি! সীমা! তোর সাথে যে ছেলেটার বিয়ের কথা চলছিল, এতো সেই ছেলে। কাল ওদের দেখতে আসবার কথা ছিল। এজন্যই তো তোকে জলদি এখানে আসতে বলেছিলাম ।

বাবার কথায় সীমা স্তব্ধ হয়ে যায়। দেরি না করে আকাশের বাড়িতে ফোন করে আকাশের মাকে দুর্ঘটনার খবর জানাবার ব্যবস্থা করলেন খলিল সাহেব। পর দিন মেয়েকে নিয়ে তিনি আকাশের খোঁজে গেলেন। অনেক খোঁজ করার পর কুমিল্লার একটা হাসপাতালে ওকে পাওয়া গেল। সেখানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল সে। পাজরের কয়েকটা হাড় ভেঙ্গে গেছে ওর। মাথায়ও প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। সে এখন কোমায়। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষনে। সীমা বেশিক্ষন আকাশকে সে অবস্থায় দেখতে পারল না। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। চৈত্রের খট খট দিনেও আকাশে এক টুকরা মেঘ জমেছে। সীমা মনে মনে প্রার্থনা করল।

– হে প্রভু, এক পশলা বৃষ্টি দাও! আকাশের জীবনে, আমার জীবনে, প্রতিটি মানুষের জীবনে। আকাঙ্খার তৃষ্ণায় সবাই তৃষিত। আকাশে উড়তে থাকা চাতকটাও ওর সাথে কন্ঠ মিলিয়ে ডেকে উঠল কয়েকবার।

বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্পের সমস্যা এবং সম্ভাবনা

মাহবুব আল মামুন বিপ্লব
জুনিয়র ম্যানেজার, প্রোডাকশন,
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তৈরী পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। তৈরী পোশাক শিল্প আমাদের বৃহত্তম রপ্তানি পণ্যের আসন গ্রহণ করেছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ খাতের ভূমিকা ব্যাপক। ১৯৭৭ সালে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। জাতীয় রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ তৈরী পোশাক খাত থেকে আসে। সুতরাং এ খাতে সম্ভাবনা যে বিপুল এতে কোন সন্দেহ নেই। এর পরেও এ খাতে রয়েছে কতিপয় সমস্যা। এ সমস্যা গুলো দুর করতে পারলে তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের উন্নয়নে আরও বড় ধরনের অবদান রাখার সুযোগ পাবে।

তৈরী পোশাক শিল্পের সমস্যাবলীঃ

অপর্যাপ্ত ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পঃ- বর্তমানে দু'ধরনের রপ্তানিকারক দেশ বিদ্যমান। প্রথমত: যারা বস্ত্র উৎপাদনকারী এবং একই সাথে তৈরী পোশাক রপ্তানীকারী। যেমন: চীন, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত: যারা তৈরী পোশাক রপ্তনিকারী কাঁচা মালের জন্য সম্পূর্ণ রূপে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। এই শ্রেনীর দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মধ্যপ্রাচ্য সহ আফ্রিকান কিছু দেশ। প্রথমোক্ত শ্রেনীর দেশ গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ আমাদের লীড টাইম প্রতিযোগী দেশ গুলোর তুলনায় প্রায় দ্বিগুন। তাছাড়া আমাদের দেশে কাঁচামাল গুলো Trans-Shipment (এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে পণ্য পরিবহন) এর মাধ্যমে আসে। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী সময়ের ব্যবধানে রপ্তানি আদেশ অনুযায়ী Shipment করতে হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবতা হল, এ ব্যাপারে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় না - সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতটির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন।

বন্ডেড ওয়্যার হাউস স্থাপনের ব্যবস্থাঃ- পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত বর্তমানে কাঁচামাল সমূহ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করার ফলে আমাদের লীড টাইম প্রতিযোগী দেশ গুলোর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। বর্তমানে ওভেন ও নিট কাপড়ের মোট চাহিদার প্রায় যথাক্রমে ৩০ ভাগ ও ৮০ ভাগ আভ্যন্তরীন উৎস থেকে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং অবশিষ্ট কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করার কারণে সময় মত রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। উক্ত সমস্যার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বন্ডেড ওয়্যার হাউস স্থাপন করা যেতে পারে যেখানে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল মজুদ থাকবে এবং এখান হতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায় যা পোশাক শিল্পের উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সরাসরি শিপিং ব্যবস্থা চালুকরণঃ- তৈরী পোশাক শিল্পের কাঁচামাল চীন, হংকং , তাইওয়ান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বন্দর থেকে Trans Shipment এর মাধ্যমে আমাদের দেশের বন্দরে এসে পৌঁছাতে ২০-২৫ দিনের প্রয়োজন হয়। যদি সুবিধাজনক স্থানে Deep Sea Port স্থাপন করা যায় তবে Mother Vessel সরাসরি এই Deep Sea Port এ ভিড়তে পারবে। তাহলে কাঁচামাল ২০-২৫ দিনের পরিবর্তে ১০-১২ দিনের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছে যাবে।

চট্টগ্রাম বন্দর সমস্যাঃ- গত ২০ বছর ধরে তৈরী পোশাক শিল্প খাতে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হওয়া সত্বেও সুযোগ-সুবিধা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। তবে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতির সঞ্চার হয়েছিল এবং আমরা আশা করছি যে, বর্তমান রাজনৈতিক সরকার দেশের বৃহত্তম স্বার্থে পর্যাপ্ত হ্যান্ডলিং Equipment এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে রপ্তানিক কার্যক্রমের গতি আরও ত্বরান্বিত করবেন।

এ ছাড়াও তৈরী পোশাক শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও অনেক প্রতিবন্ধকতা, হুমকি রয়েছে। এ গুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে এ শিল্পের বর্তমান অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা, ভবিষ্যৎ প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নিয়ে যদি সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে তবে তৈরী পোশাক শিল্প খাতটি উপকৃত হবে।

অবকাঠামোগত সমস্যাঃ

যোগাযোগ ও পরিবহনঃ- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত না হলে পণ্য পরিবহনের সময় ও খরচ দু'টোই বৃদ্ধি পায়। দেশের তৈরী পোশাক শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ কাঁচামাল আমদানী ও শতকরা ৯০ ভাগ পোশাক রপ্তানি চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই দেশের শিল্পাঞ্চলের সাথে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার সাথে চট্টগ্রামের সড়ক ও রেল যোগাযোগের উন্নয়ন অপরিহার্য।

টেলি যোগাযোগঃ- বাংলাদেশে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখনও অত্যাধুনিকতার ছাপ তেমন একটা পরেনি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এখন সময়ের দাবী। আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। ফ্যাক্স, ফোন, ইন্টারনেট সহ সকল আধুনিক টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ লভ্য এবং এদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোতে যেখানে ই-কমার্স এর মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণের দ্বার উন্মোচন করছে, সেখানে আমাদের রপ্তানিকারকরা এ ধরনের সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত।

বিদ্যুৎঃ- বর্তমানে লোড শেডিং প্রতিদিন প্রায় গড়ে ৪ ঘন্টা। ফলে উৎপাদন বন্ধ থাকার কারনে উৎপাদন ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। ঘন ঘন লোড শেডিং এবং ভোল্টেজ উঠা নামার কারণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয় ও আয়ুষ্কাল কমে যায়। ফলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

সনাতনী কাস্টমস পদ্ধতির পরিবর্তনঃ- পোশাক শিল্পের বিকাশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টমস এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এখন পর্যন্ত আমরা পুরাতন কার্যকলাপ থেকে মুক্তি পাইনি। কাস্টমস থেকে মালামাল যাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খালাস করা সম্ভব হয় সেই দিকটি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কাস্টমস এর কার্যকলাপ কম্পিউটারাইজেশন করায় বর্তমানে এর সেবার মান আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে, যদিও তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

প্রশাসনিক জটিলতাঃ- আমদানী ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক জটিলতা দুর করতে হবে। বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বন্ড লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ২০-২৫ Document Submit করার প্রথা রয়েছে, যা সময়

সাপেক্ষ ও জটিল। প্রশাসনিক ব্যয়ও কমাতে হবে।

এ ছাড়াও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরী পোশাক শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার প্রায় চার দশক হতে চলছে এখনও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। প্রায় সময়ই বিভিন্ন কারণে সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ, ধর্মঘটের মত কর্মসূচী তৈরী পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে।

তৈরী পোশাক শিল্পের সম্ভাবনাঃ

তৈরী পোশাক শিল্প ইতোমধ্যে একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ শিল্প বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

সস্তা শ্রম প্রাপ্যতাঃ- বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শ্রমের মূল্য তুলানামূলকভাবে সস্তা। অল্প মুজরীর বিনিময়ে তৈরী পোশাক দ্বারা তাই অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।

নারী শ্রম প্রাপ্যতাঃ- বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের মতো এত অধিক সংখ্যক নারী শ্রমিক তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত নেই। এই শিল্পের সাথে জড়িত মোট শ্রমিকের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই নারী। পোষাক শিল্প বান্ধব নারী শ্রমিক এই শিল্পকে স্থায়ীত্ব দানে ও গতি সঞ্চারে ভীষণ ভাবে সহায়তা করে।

উদার শিল্প নীতি/কর অবকাশঃ- তৈরী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার উদার শিল্প নীতি গ্রহণ করায় বেসরকারী পর্যায়ে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আবার কর অবকাশ সুবিধার কারণেও উদ্যোক্তাগণ নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহী হচ্ছে।

সহজ শর্তে ঋণের প্রাপ্যতাঃ- তৈরী পোশাক শিল্পে বিনিয়োগের পর তুলনামূলক ভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে Return পাওয়া যায়। বিনিয়োগকৃত মূলধন দ্রুত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ এই শিল্পের সংগে জড়িত উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে।

তৈরী পোশাক শিল্প অধিক লাভজনক খাত হিসেবে ইতোমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্প ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দিনে দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে তাই এই শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা উচিত।

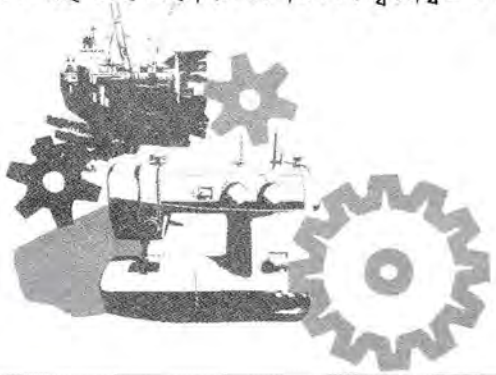

অনীল দিগন্ত

মোঃ জোবায়দুল ইসলাম
জুনিয়র অফিসার, ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ

তোমার এবং তোমাদের
অনুপস্থিতি তাড়িত করে আমার চাঞ্চল্যের তীরে।
নিত্যতার খোলা জানালায় – ভোরের রক্তিম সূর্যে
স্নান করি –
ডানা মেলে উড়ে যাবার স্বপ্ন
দুহাত মেললেই অনুভব করি –
রক্তস্নাত নদীর জলে মাটির শপথ মিশে আছে –
উত্তাল তরঙ্গে প্রতিনিয়তই ভাসে তোমার বজ্রমুষ্টি।
তোমায় ভালবাসি –
ভাললাগার মত কত কথা লিখে রেখেছি
দিন পঞ্জিতে – তুমি আসো না।
এসো –
ভালবাসার সমস্ত ফুল উৎসর্গ করব তোমার জন্য
এলেই দেখবে –
পৃথিবীতে এখনো শান্তি চাই –
যুদ্ধের নতুন কোন সাইরেন বাজছে –
বাংলাদেশের মানচিত্রে কেউটে সাপের বিষ ছুঁয়েছে
ভিয়েতনামে উড়ছে মুক্তির পতাকা।
তুমি তরঙ্গায়িত মিছিল নিয়ে এসো –
আফ্রিকার কালোমানুষ এখনো নির্যাতিত।
ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, কঙ্গো, প্যালেস্টাইন
নামিবীয়া, চেচনিয়া – ওরা কতদিন –
সেই কতদিন মুক্তির স্বাদ চাইছে –
তুমি এসো –
না এলে প্রতিনিয়তই স্নায়ুযুদ্ধ চলবে
বিশ্বের ঘরে ঘরে ।
জানি তোমার ক্ষতে এখনো দাগ
তবুও তুমি এসো –
তুমি কি চাও – ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ পারমানবিক
অস্ত্র – ধবংসযজ্ঞ তান্ডবলীলা – ?
এলেই দেখতে পাবে –
কালো মানুষের মুক্তিকামী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা
এখনো বেঁচে আছে –
সমাজতন্ত্রের লৌহমানব ফিডেল কাস্ট্রো বেঁচে আছে।
না – এলে
পুঁজিবাদের দেয়াল আরো বেড়ে উঠবে।
তুমি তোমার রূপ ধরে এসো –
সেই কবে – হো-চি-মিন, চে গুয়েভারা, বাঘা যতীন
প্রীতিলতা, মাষ্টারদা, সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম –
এসেছিল –

তুমি এসো –
তোমাকে সুকান্তের কবিতা শোনাব
তুমি আসলেই পাবলো নেরুদা,
বেঞ্জামিন মলয়েজ এর কবিতা
শোনাব –
বিদ্রোহী কবির, বিপ্লবী মন্ত্র শেখাব

তুমি – বিদ্রোহীর মত
আগ্নেয়গিরী হয়ে জ্বলবে –
পুড়ে যাবে পুঁজিবাদী
গোটা বিশ্ব –
তোমাতে নতুন স্বপ্ন দেখবো..।

খুঁজেছি তোমাকে

ইশরাত জাহান ইভা
ফ্রন্ট ডেস্ক, অবণী নীটওয়্যার লিঃ

পূবের রবির আবছা আভায়,
ভেসে আসা হাসনা হেনার সুবাস মাখানো
মিষ্টি সমীরণে
ঝরে যাওয়া বকুলের গন্ধে,
মাতাল ভোরের পাখির মিষ্টি কুহুতানে
খুঁজেছি তোমাকে।

নীল অম্বরে ভেসে যাওয়া
সাদা মেঘের ভেলায়,
ভরা তটিনীর দু'ধারে
ফুটে থাকা শুভ্র কাশফুলে
খুঁজেছি তোমাকে।

পড়ন্ত বিকেলে নীড়ে ফেরা ক্লান্ত
হংস মিথুনের মাঝে
গোধূলী বেলায় স্থির সাগরের মন মাতানো দৃশ্যে
খুঁজেছি তোমাকে।

সন্ধ্যা তারার মিটিমিটি আলোতে
নিভু নিভু প্রদীপের শিখায়,
গভীর রাতে নির্ঘুম ডাহুকের কণ্ঠে
আর আমার হৃদয়ের লালিত স্বপ্নে
খুঁজেছি তোমাকে।

রক্তের দাম

মোঃ সাইফুল ইসলাম
অপারেটর, ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ

দেশটা স্বাধীন, স্বাধীনতা
বাঙ্গালীদের ঘরে
তবুও কেন হর হামেশা
মানুষ কেঁদে মরে ?
আঘাত আসে মানবতায়
বিবেক করে রুদ্ধ
এই কারনে হয়েছিল
একাত্তরের যুদ্ধ ?

সোনার দেশ

মোঃ মফিজুর রহমান
কিউ.সি., ফিনিশিং,
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

ঝিলের জলে শাপলা ফোঁটে
দোয়েল ডাকে গাছে,
এমন সোনার দেশ বলো তো
আর কোথাতে আছে ?

নদীর বুকে নৌকো চলে
মাঠে ফলে ধান
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি
বাউল শোনায় গান।

মায়ের যত আদর স্নেহ
শিশুর আছে হাসি,
তাইতো আমি এদেশটাকে
ভীষন ভালোবাসি।

আকাশ নীলে

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
জুনিঃ ওয়েলফেয়ার অফিসার
এইচ.আর.ডি., সুরভী গার্মেন্টস লিঃ

আকাশে যখন থমথমে মেঘ জমবে
বৃষ্টিরা সুরের আসর বসিয়ে –
অঝোরে ঝরবে,
তখন অলস অবসরে ফিরে এসো
কোন এক ভাল লাগা কবিতার চরণে।

যখন পথের ক্লান্তিতে নিঃস্বঙ্গে নিঃস্বঙ্গ লাগবে
তখন পুরানো সেই দিনে ফিরে এসো
মনে মনে।

যখন হৃদয় আকাশে পুরোনো স্মৃতিরা
পুনঃরাবৃত্তি করবে
তখন ফিরে এসো নজরুল আর,
রবীন্দ্রনাথ এর গানে গানে।

যখন কোন কষ্ট এসে মনের
জানালায় উঁকি দিবে
অজানা স্মৃতিরা জাগ্রত হবে
তখন ম্লান মনে অনুশোচনা না করে,
খুঁজে নিও আকাশের নীলকে।

যখন আবেগে হৃদয়ে
সূচনা হবে আনমনার।
তখন আবেগে বশিভূত না হয়ে
এসে দাঁড়াও নীলাকাশের ছায়াতলে।

পূর্নতার ছায়া তলে না হোক
শূন্যতার হিম জলে আমায়
মনে করো
আকাশ নীলে।

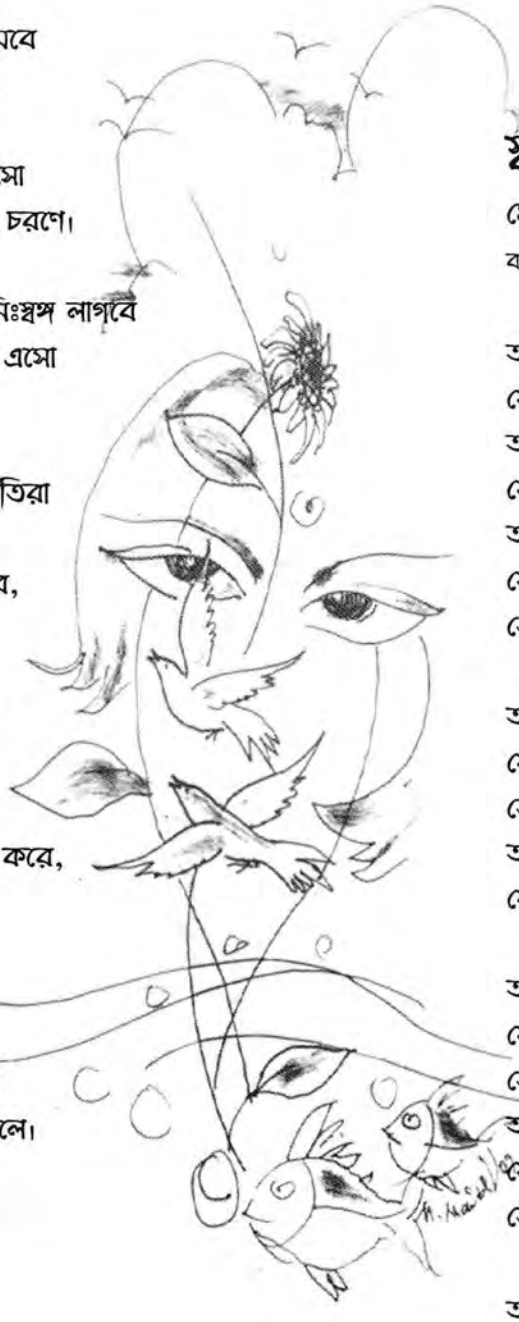

স্বপ্ন প্রেমিক

মোঃ কাওছার
বাবুর্চি, অবনী নীটওয়্যার লিঃ

আমি সূর্য নই
যে তোমাদের আলো দেব।
আমি আকাশ নই
যে বিশাল নীল আঁচল দেব।
আমি বাতাস নই
যে ঠান্ডা হাওয়ায়
তোমাদের স্নিগ্ধ করবো।

আমি ক্ষেত নই
যে সোনার ফসল ফলিয়ে
তোমাদের অন্ন জোটাবো।
আমি চাঁদ নই
যে রাতের আধাঁর দুর করবো।

আমি নদী নই
যে স্রোতের টানে
তোমাদের নিয়ে ভেসে বেড়াবো।
আমি গায়ক পাখি নই
যে কন্ঠে মধু ঢেলে
তোমাদের গান শোনাবো।

আমি ফুল নই
যে ফুলের গন্ধে
তোমাদের সুবাসিত করবো।
আমি শুধু এক হৃদয়ের বসতবাড়ী সন্ধানী
স্বপ্ন প্রেমিক যুবক।

বন্ধু রাজীব এবং তাঁর ভ্রমনবৃত্তান্ত

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচ আর ডি এন্ড কমপ্লায়্যান্স
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

"জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রন
ধন্য হলো, ধন্য হলো মানব জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবন আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন...."

আমার বন্ধু রাজীব। রবীন্দ্রনাথের এই গানটিই ওর জীবন দর্শন। জগত সংসার তন্ন তন্ন করে এর বহু বিচিত্র রূপের সৌন্দর্য আর শব্দের মাধুর্যে মুগ্ধ হবার জন্য ওর নিরন্তর ব্যাকুলতা আমাকে বিস্মিত করে। সরল, সুন্দর আর মানুষের সাথে ভীষন সাবলীল এই মানুষটার সাথে আমার সখ্যতার বয়স আঠার-উনিশ তো হবেই। রাজীবের চরিত্রে আনন্দিত হবার ক্ষমতা যেমন প্রবল ঠিক তেমনি আনন্দ দেবার প্রবনতাও অসীম। ওর শখের তালিকা দীর্ঘ এবং বৈচিত্রপূর্ণ হলেও ভ্রমণের প্রতি রয়েছে ওর অদম্য পক্ষপাত। অদম্য বলছি এই জন্য যে, আর্থিক অসংগতি কিংবা অন্য কোন বিপত্তি রাজীবের ভ্রমণ বাস্তবায়নে খুব একটা বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেনি কখনোই। মাত্র একুশ'শ টাকা সম্বল করে যে মানুষ চট্টগ্রাম থেকে ভারত হয়ে নেপালের লুম্বিনি পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারে, তাকে অদম্য পর্যটক না বলে আর কি-ই বা বলা যেতে পারে। গল্পটা অবিশ্বাস্য মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে ওর বিষয়ে যারা পরিচিত তারা আমার মতো শুধু কৌতুহলীই হবে কাহিনীটা শোনার জন্য। ওর সাবলীল বর্ণনায়- এটা হলো ইচ্ছাশক্তি আর কৌশলের ব্যাপার। ইচ্ছাটাই ছিল চাবিকাঠি আর কৌশলটা ছিলো নিয়ামক। নেপালগামী একটা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী দলের সহযাত্রী হিসেবে যাত্রা শুরু। মাথা ন্যাড়া করে, গায়ে গেরুয়া কাপড় জড়িয়ে শুরু হয় পায়ে হাঁটা। মাইলের পর মাইল। জনপদের পর জনপদ। থাকা খাওয়ার জন্য কোন এক প্যাগোডায় রাত্রি যাপন। পথে অসংখ্য বসতি-নিসর্গ-পাহাড়-সমতল অতিক্রম করার সময় নিজেকে অতীশ দিপঙ্কর ভাবতে ভাবতে এক সময় নেপালে গিয়ে পৌঁছাই। ওখান থেকে লুম্বিনি...।

রাজীবের বিস্ময়কর ভ্রমনের এরকম অসংখ্য অভিজ্ঞতা আছে। মাত্র সাতষট্টি টাকা সম্বল করে এই বঙ্গ দেশের উনিশটি জেলা ঘুরে বেড়াবার বিরল কৃতিত্ব অন্য কারো আছে কি-না অন্তত আমার জানা নেই। এ যাত্রার অবলম্বন কিন্তু কোন বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী দল নয়। ক্লাসের প্রায় সবার সাথে ওর বন্ধুত্ব ছিলো; বৈরীতা কারো সাথেই খুব একটা দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দীর্ঘ বন্ধের সময় ওর সহপাঠীরা যখন স্থায়ী ঠিকানায় ছুটি কাটাচ্ছিলো ঠিক তখনই ও ভ্রমনে বেরিয়ে পড়ে। কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে ২/১ দিনের সাদর আতিথ্য গ্রহণ, বন্ধুর গাঁটের টাকায় আশেপাশের এলাকাগুলো পরিদর্শন এবং শেষে পরবর্তী গন্তব্যে যাবার সময় পথ খরচের টাকাটা পর্যন্ত নিয়ে নতুন ঠিকানায় গমন। এই ছিলো ওর অভিনব ভ্রমন কৌশল। এভাবে পর্যায়ক্রমে ১১ জন বন্ধুর আদর-দাক্ষিন্নে উত্তর আর মধ্য বঙ্গের ১৯ টি জেলা ঘুরে ও যখন চট্টগ্রামে পৌঁছালো তখন ওর হাতে বেশ কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিলো।

আমার ভ্রমনের ঝুলিটা অতটা নাটকীয় আর বিস্তৃত না হলেও ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের অনেকটা জায়গাতেই আমি রাজীবের ভ্রমন সংগী হয়েছি। ওর সাথে ভ্রমনের মজাটা হলো, কোন নতুন এলাকার মানুষ, নিসর্গ আর জীবনাচার সম্পর্কে ও এমন সব মজার মজার ব্যাখ্যা দাঁড় করায় যে, তা ভ্রমনের সাথে বাড়তি পাওনাই হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক কোন একজন ব্যক্তির কোন অরুচিকর আচরন দেখে ও হয়তো মন্তব্য করলো যে- এই লোকটাকে প্রতিদিন কম করে হলেও ১০টা রবীন্দ্র সংগীত শোনানো দরকার। তাহলে যদি ওর রুচির পরিবর্তন ঘটে। ওর ধারনা-

বাঙ্গালীর রুচি, সৌন্দর্য আর আভিজাত্য নিশ্চিত করতে হলে রবীন্দ্র সংগীতের কোন বিকল্প নেই। সরকারের উচিত রবীন্দ্র সংগীত শোনাটাকে আইন দ্বারা বাধ্যবাধক করা।

গত প্রায় বছর দু'য়েক হলো রাজীব চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে অনেকটা স্থায়ী আবাস গেড়েছে। এক সময়ের চট্টগ্রামের মতো আমরা দুজনেই আবার একই নগরীর অধিবাসী। এই শহরের অসহ্য যানজট, বৃষ্টিতে নোংরা জলের প্লাবন, মানুষের ভীড়, অবিরাম শব্দ দুষন ইত্যাদি কারণে রাজীবের ভাষায়- এটা একটা পরিত্যক্ত নগরী। এখন শুধু সরকারী ঘোষনাটাই বাকী। যদিও চাইলেই কেউ শহরটাকে পরিত্যাগ করতে পারেনা।

রাজীবের সাথে ভ্রমনের নেশা আমাকে এখনো তাড়িত করে। আমার অফিস-সংসার, রাজীবের এডিটিং আর ভিডিওগ্রাফির ব্যস্ততা আমাদের দীর্ঘ ভ্রমনের পথগুলো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। গত কিছুদিন হলো আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার অজুহাতে জগিং এর নামে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ভ্রমন করছি আর দুধের স্বাধ ঘোলে মিটিয়ে তাতেই বেশ তৃপ্তির ঢেকুর তুলে দু'জনেই ভ্রমন তৃষ্ণা মিটাচ্ছি। গার্ডেনের বৃক্ষ বৈচিত্র আর অরন্যের গাম্ভীর্য দেখার জন্য এর আগে আমি বহুবার গার্ডেনে গিয়েছি। কিন্তু ভোরের বোটানিক্যাল গার্ডেন যে কতটা গম্ভীর আর সুন্দর হতে পারে এ সম্পর্কে আমার কোন ধারনাই ছিলোনা। ভোরের আলো বাড়ার সাথে সাথে জগিং এ আসা মানুষের পায়ের শব্দে গার্ডেনের আভিজাত্যের মাত্রা কমতে শুরু করলেও তা এর সৌন্দর্য হানি ঘটায়না বিন্দু মাত্রও। বরং স্বাস্থ্য সচেতন মানুষগুলো দেখে এক ধরনের আনন্দই পাওয়া যায়। আর এই আনন্দের মাত্রা দ্বিগুন-তিনগুন বাড়তে থাকে রাজীবের সেই সহজাত কৌতুককর ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে। রাজীবের ভাষায়-বিচিত্র ধরনের জগারুগন এখানে জগিং করতে আসে। জগিংয়ে আসা মানুষগুলোকে ও নাম দিয়েছে 'জগারু'। ওর মতে এটা হলো জগার এর বাংলা নাম। ওর জগারু বৈচিত্রের বিশ্লেষনগুলোও কম মজার নয়। গার্ডেনের একেবারে উত্তর পূর্ব কোনায় যে লোকটা প্রায় প্রতিদিন খুব অল্প বিস্তর নড়াচড়া করে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর ভংগীতে জগিং করতে থাকেন- রাজীবের ভাষায় উনি হলেন "নিভৃতচারী জগারু"। বোটানিক্যাল গার্ডেনে না এসে ওনার উচিত ছিলো কৈলাসে গিয়ে ধ্যান-নিমগ্ন হওয়া।

রাজীবের দেয়া আর একজন জগারুর নামকরন আমার বেশ যৌক্তিক মনে হয়। বেশ লম্বা আর জাকালো চেহারার এই ভদ্রলোকের জগিং কার্যক্রম অনেকটা দৌড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মুশকিল হলো ভদ্রলোক দৌড়ের সময় তার হাত-পা গুলোকে এমন তীব্র গতিতে এদিক ওদিক ছুড়তে থাকেন তাতে আশেপাশের কেউ অসাবধানতাবশতঃ তার ত্রি-সীমানায় এসে পড়লে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে যাবার সম্ভাবনা অনেকটাই নিশ্চিত। রাজীব এই ভদ্রলোকের নাম দিয়েছে "বিপদজনক জগারু"। ওর মতে - গার্ডেন কর্তৃপক্ষের উচিত লোকটার গায়ে একটা Danger Sign ঝুলিয়ে দেয়া। এই লোকটাকে দুর থেকে দেখা মাত্রই রাজীব আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে জগিং বন্ধ করে রাস্তার পাশে নিরাপদ দুরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রায় প্রতিদিনই বেশ কিছু পরিবারকে একসংগে গার্ডেনে দেখা যায়। এরা অবশ্য দৌড় বা অন্যান্য শারীরীক জগিং এর পরিবর্তে একটু জোরে হাঁটতেই পছন্দ করেন। রাজীবের মতে, এরা হলো- "পারিবারিক জগারু"। পারিবারের কর্তা শুধু নিজের স্বাস্থ্য নিয়েই ভাবেন না; পুরো পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতন।

পাঁচ জনের একটা জগারু দল প্রতিদিনই গার্ডেনে আসলেও এদেরকে কখনোই আমরা জগিং করতে দেখিনি। শাপলা পুকুরের বাধানো ঘাটের সিঁড়িতে বসে বেশ জম্পেশ আড্ডা দিয়েই এরা পুরোটা সময় কাটিয়ে দেয়। ওর মতে- এরা হলো "আড্ডাবাজ জগারু"। ওর ভাষায়-পরকালেও এদেরকে আড্ডাবাজ হিসেবেই দেখা যাবে।

গার্ডেনের পদ্মপুকুরের পাশে ছাউনির ভিতর দাঁড়িয়ে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের যে ভদ্রলোক বেশ জোরে জোরে গলা

খেঁকিয়ে গলার ব্যায়ামের নামে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকেন রাজীব তার নাম দিয়েছে "গলাবাজ জগারু"। ওর মতে– গার্ডেন কর্তৃপক্ষের উচিত এই গলাবাজ জগারুর জগিং কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে অন্য লোকজনকে শব্দ দুষনের কবল থেকে রক্ষা করা।

রাজীবের দেয়া জগারু শ্রেনীর মধ্যে আরো আছে নিনজা জগারু, সাইবেরীয় জগারু, তালেবান জগারু ইত্যাদি সব বিচিত্র নাম। তবে গার্ডেনে আগত জগারুগনের মধ্যে যে মানুষটাকে রাজীব অন্যদের তুলনায় একটু অতিরিক্ত শ্রদ্ধা করেন, তিনি প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধ। শাপলা পুকুরের পশ্চিম পাশে একটা নির্দিষ্ট স্থানে দাড়িয়ে অশীতিপর এই মানুষটা জীবনটাকে আরো কিছুটা সুস্থ আর দীর্ঘায়িত করার জন্য যে নিরন্তর শারীরিক সাধনায় নিমগ্ন থাকে তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে কোন উপায় থাকেনা। "মৃত্যু পথযাত্রী সংগ্রামী" এই জগারুকে দেখলে আমার একটা কবিতার ক'টা লাইন মনে পড়ে। অনেকদিন আগে কোন একটা বহুজাতিক কোম্পানীর প্রকাশিত ক্যালেন্ডারে দেখেছিলাম। অনেকটা এই রকম–

"বেঁচে থাকা খুব ভাল,
জীবন অনন্ত মধুময়।
আছে প্রেম, আছে ফুল
মাতৃস্নেহ পাখির হৃদয়।"
.....

নির্বান

শামীমুল ইসলাম
ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন

তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। গোধুলীর আভা পশ্চিম আকাশে। কৃষকেরা হাল-বলদ গুছিয়ে বাড়ী ফিরছে। বলদের মুখে একটু আগের লাঙ্গল টানার ক্লান্তি, লালা ঝরছে মুখ থেকে। পাখিরা কেউ নীড়ে ফিরছে, অনেক ফিরেছে আগেই। পাশের বাঁশঝাড়ে তাদের কিচির মিচির শব্দ। একটা শব্দ বেশ চিকন। ধারালো সুরে ছোট হলুদ পাখি একমনে ডেকে যাচ্ছে। এই ডাক প্রেমের, এই আহ্বান ফিরে আসার।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের যে খালটি কুষ্টিয়া থেকে শৈলকূপা হয়ে একে বেঁকে পশ্চিম পাশ দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেছে সেখানে একটা বটগাছ ছিল। খালের পাড় বেয়ে দু'এক কদম নামতেই বটগাছটি চোখ পড়ে। এই সন্ধ্যায় নীরব একাকিত্ব নিয়ে কালের স্বাক্ষী হয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে তরুরাজ। ছোটবেলায় ওরা যখন বটগাছের মাঠে খেলা শেষে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরত তখন সারাদিনের কর্মক্লান্ত পাখিরা ফিরত বটবৃক্ষে। সবাই কি এভাবেই একদিন ফিরে আসে। এখন বর্ষা। খাল ভরা পানি। আবছা আলোয় পানির ফেনাগুলো দেখা যায়, দেখা যায় সেগুলো পূর্বদিকে ভাটিতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। পানির কলতানকে বাঁয়ে রেখে ডান দিকের রাস্তায় পা বাড়ায় বাদল। আর একটু এগোলেই কয়েকটি খেজুর গাছ। এরপর মোড় ঘুরতেই রাস্তার দু'পাশে বেশ কটা টিনের পাকা ঘর। বাড়িগুলো সব নতুন। দেয়ালের পলেস্তারা অক্ষত, ঝকঝকে। বাড়িতে বাড়িতে বিজলী বাতির আলো। পাশের কোন রান্নাঘর থেকে খাবারের সু'বাস এসে লাগে নাকে। বটগাছের মাঠটি এখন আর নেই। বাড়িগুলোর ধোঁয়া বৃদ্ধ ন্যাড়া বটগাছের অবশিষ্ট পাতাগুলির জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করছে।

বদলে যাওয়া গ্রামের পথ ধরে এগোতে থাকে বাদল। রেডিও অথবা টেলিভিশনের শব্দ শোনা যায়। রেডিও নয়, বাদিকের বারান্দায় টিভি চলছে। আগে সন্ধ্যে হলে গ্রামের সবাই বাদলদের বাড়ি আসত রেডিও শুনতে। বয়স কম হলেও বাদল থাকত মজলিশে। হারিকেনের আবছা আলোয় গ্রামের আদান প্রদান হতো সেখানে। এখন বাড়িতে বাড়িতে রেডিও, টিভি, বিজলী বাতি।

সামনে একটা পুকুর। বাদল বুঝতে পারে এটাই বাবলুদের পুকুর। বাবলুদের পূর্ব পুরুষরা এই পুকুর কাটিয়েছিলেন। এটাকে বলা হতো গোর দরিয়া। গোর দরিয়া নামের ইতিবৃত্ত জানা ছিল না কারও। পুকুরের পশ্চিমে ভেঙ্গে পড়া ঘাটেও একটা বাতি ঝুলছে। এইখানে রাস্তা আর গোর দরিয়ার পাড় একাকার। পুকুরের শেষে বাবলুদের বাড়ি। বাড়িঘরের গা ঘেসে বাদল এগোতে থাকে। আগের দিন হলে কেউ না কেউ বলে উঠত, কে মদন নাকি ? সুহানুভূতির স্বরে কেউ হয়তো বলে উঠতো, মান্না এত রাত হল ফিরতে। গরমের দিন সাবধানে যেও-কত কি? অথচ এই সন্ধ্যায় বাদলকে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। বাদল বুঝতে পারে পুরো গ্রাম জুড়ে পরিবর্তন এসেছে। ও ভাবতে থাকে মা-দীপা সবাই কি বদলে গেছে! স্বাধীন দেশে ১৩ বছর পর বাড়ী ফিরছে সে।

১৯৬৭ সাল। বাদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। স্কুলে গোবিন্দ স্যার বাদলকে বলেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে পড়তে। স্যার বলতেন বাদলের মত ছাত্র নাকি তিনি এই স্কুলে আর দেখেননি। কলেজে এসেও বাদল ইংরেজিতে ভাল করল। গোবিন্দ স্যারের কথামত সে ইংরেজিতে ভর্তি হয়ে গেল। বাদল ততদিনে জড়িয়ে গেছে রাজনীতিতে, ছাত্র ইউনিয়নের সামনের কাতারের কর্মী। ইংরেজি সাহিত্যের চেয়ে রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করে সে। ক্লাসের উপস্থিতির চেয়ে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে বেশি উপস্থিতি তার। প্রথম বর্ষ পার হতে না হতেই পুরাদস্তুর নেতা বনে গেল বাদল।

দিনগুলি দ্রুত কেটে যায়। মায়ের চিঠি আসে। বাদলের উত্তর দেওয়ার সময় নেই। ৬ দফা আর ১১ দফার আন্দোলনের মধ্যে একদিন বাদলের খুবই ঘনিষ্ঠ আসাদ শহীদ হলেন। আন্দোলন-সংগ্রাম, পাঠচক্র, পার্টির গোপন মিটিং করতে করতেই একদিন সামনে চলে এল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্ন। এই প্রশ্নে এক মৌলিক বাঁক নিয়ে নিল বাদলের জীবন। সিরাজ শিকদারের গ্রুপে ঢুকে গেল সে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলা বাদলের। বাংলার স্বাধীনতা চাই, স্বাধীন বাংলা চাই।

বাদল হল ছেড়ে দিয়েছে, স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই। একটার পর একটা চিঠি এসে হলে পড়ে থাকে। বন্ধুরা প্রথম প্রথম ওর খোঁজ খবর করে কয়েকটা চিঠি পৌঁছে দিয়েছিল। পরে আর তা হয়নি। কেউ কেউ হল ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেছে, কেউ যুদ্ধে গেছে, কেউ কেউ অবশ্য তখনও বিশ্ববিদ্যালয় আগলে পড়ে আছে ভাল কিছুর আশায়। বাদল যুদ্ধে গেছে, সে যুদ্ধ শুধু স্বাধীনতার নয়। যে স্বাধীনতায় মানুষ পেট পুরে খেতে পাবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার পাবে, প্রত্যেকে জীবন ও বোধ বিকাশের সমান সুযোগ পাবে-বাদলরা চায় সেই স্বাধীনতা।

মায়ের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মাকে দেখতেও ইচ্ছে করে। আর দেখতে ইচ্ছে করে ছোট বোন দীপাকে। মনে পড়ে মনীষাকে - হেড স্যারের মেয়ে। ব্যক্তিগত এই অনুভূতিগুলো কোনভাবেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না বাদল। কোথায় যেন পেটি বুর্জোয়াসুলভ একটা পিছুটান তাকে টেনে ধরে। বাদল ভুলে যায় এসব, কখনও কখনও ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

ট্রেনিং-এর জন্য ভারতে যেতে না পারলেও বাদলরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন থানা, জেলার অস্ত্রাগার লুট আর যুদ্ধে পরাজিত পাক আর্মির কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রে ওদের ভান্ডার বাড়তে থাকে। পুলিশ, আর্মি, ইপিআরের অনেকেই ওদের সাথে যোগ দেয়। ভারত থেকে ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধারাও দেশে ঢুকতে থাকে। ভারত থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কোথাও কোথাও বাদলদের মিত্রতা গড়ে ওঠে, কোথাও কোথাও বোঝাপড়া মেলে না। যুদ্ধের মাঝামাঝি নতুন সঙ্কট তৈরী হয় বাদলদের জন্য।

ভারতে ট্রেনিং পাওয়া বিশেষ এক বাহিনী দেশে আসে। বিশেষ বাহিনী পাক আর্মি নয়, টার্গেট করে বাদলদের। পাক আর্মির সাথে যুদ্ধ, বিশেষ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ- দ্বিমুখী যুদ্ধের মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বাদলরা। যুদ্ধের শেষ দিকে যুদ্ধ বন্ধ রেখে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালাতে হয় ওদের। আত্মরক্ষার সময়কালেই ১৯৭২ এর মাঝামাঝি এক রাতে বাড়ী আসে বাদল। ১৩ বছর আগে মায়ের সাথে ঐ বাদলের শেষ দেখা। বাদলের বিপজ্জনক পথ চলার খবর জানা ছিল মায়ের। তার শিক্ষিকা মা স্বভাবসুলভ কম কথা বলেছিলেন সেদিনও। বাদলকে কাছে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন। মায়ের চোখের অশ্রু বাদলের চোখ এড়ায়নি।

রাতের খাবার শেষ করতে না করতেই আয়াজ চাচা বাদলকে সরে যেতে বলেছিলেন। বলেছিলেন এলাকার অবস্থা ভাল না। যা ইচ্ছে তাই করছে রওশন বাহিনী। ব্যাপক প্রচার হয়েছে বাদলরা কমিউনিস্ট। রওশন বাহিনীর কাজ হচ্ছে কমিউনিস্টদের শায়েস্তা করা। রাজাকারদের জন্য কান ধরে ওঠবস, আর কমিউনিস্ট হলে মৃত্যুদন্ড অনিবার্য। চাচা ঐ রাতেই ভূলন মাঝিকে বলে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে মাগুরা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাথে দিয়েছিলেন নিজের ছেলে তপনকে। বাদলের স্বল্পভাষী মা শুধু বলেছিলেন আমি এই জেনে যেতে চাই যে, আমার ছেলে কোন অন্যায় করছে না। রাতের সেই নৌকা ভ্রমণের সময় বাদল নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিল আদৌ কোন অন্যায় সে করছে কি না। সে আশ্বস্ত হয়, তাদের লড়াই মানুষের জন্যে, সমাজের মুক্তির জন্যে।

ফেরার সময় ছোটবোন দীপা কেঁদে কেঁদে বলেছিল, ভাইয়া তুমি যেওনা। আবার আসন্ন বিপদের কথা আচঁ করে তাড়াতাড়ি চলে যেতেও বলেছিল।

নৌকায় বসে হেডস্যারের বাড়ি যাবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাদলের। বাদলের মাহী কাকী মানে হেডস্যারের স্ত্রী আর মনীষার কথা মনে পড়ছিল। লজ্জায় বা ব্যস্ততায় অথবা নিজের গাম্ভীর্য ধরে রাখতে এদের কথা কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। মনীষা বাদলের ৫/৬ বছরের ছোট। ও এখন কি করে, কোথায় আছে জানে না বাদল। অবশ্য কোনদিনই মনীষার বেশি খবর রাখা হয়নি তার।

মাগুরা পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। বাদল সরাসরি ঢাকার গাড়ীতে উঠল না। তখন কমিউনিস্ট খুঁজতে সরকারী পার্টির লোকেরা যেখানে সেখানে গাড়ী তল্লাসী করছে। সাবধানতা হিসাবে প্রথমে রাজবাড়ী গেল বাদল। তারপর পার্টির শেল্টারে শরীয়তপুর চলে এসেছিল।

স্বাধীন দেশে মানুষের দিনবদলের স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়ল। বাদলরা দেখল প্রভূত্ব বিস্তারের হানাহানি চারদিকে। সবখানে নৈরাজ্য। রাষ্ট্রের নয়, সরকারী দলের আইন চলছে সর্বত্র। বাদলরা নতুন করে সংগঠিত হতে থাকল। মানুষ সাড়া দিল বাদলদের ডাকে। তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। হাতে অনেক অস্ত্র চলে এল। আবার শুরু হল দিনবদলের সংগ্রাম।

থানা দখল, ফাঁড়ি দখলের মত অনেকগুলো সফল অপারেশন চালাল বাদল নিজেই। বিভিন্ন জায়গায় সরকার দলীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হতে থাকল। আর্মির কয়েকজন মেজরের সাথে যোগাযোগ গড়ে উঠল বাদলদের। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, সরকারী কর্মচারী, ক্যান্টনমেন্ট সবখানে বারুদের গন্ধ। সংগঠন ছড়িয়ে পড়ল দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। দিন বদলের সংগ্রামে ওরা প্রত্যেকে তখন এক একজন মাও সেতুং। লাল বইয়ের মোড়ক উল্টালেই লংমার্চ লংমার্চ।

দেশে বাকশাল কায়েম হল। একদিন বাদলদের নেতা সিরাজ শিকদার বন্দী অবস্থায় নিহত হলেন। তারপর ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বাঙ্গালী জাতির অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানও নিহত হলেন সপরিবারে। ক্ষমতা দখল করল সেনাবাহিনী। বাদলদের সমাজতন্ত্র কায়েমের স্বপ্ন ফিকে হতে থাকল। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই নেমে এল এলাকা দখলের লড়াইয়ে। নানামুখী বিতর্ক শুরু হল দলে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। বুঝে না বুঝে কমরেডরা এ গ্রুপ সে গ্রুপে যুক্ত হয়ে গেল। দুই দফা গ্রেফতার করা হল বাদলকে। দ্বিতীয়বার জেলে থাকা অবস্থাতেই বিভিন্ন গ্রুপ বাদলকে তাদের গ্রুপে ভেড়াতে ব্যর্থ হয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলো। কার্যত: একা হয়ে গেল বাদল।

১৯৮৫ সালের ১৫ আগষ্ট মুক্তি পেল বাদল। কোথায় যাবে সে? দলের কারো সাথে কোন যোগাযোগ নেই। পরিবারের কারো সাথে কোন সম্পর্ক নেই। পা বাড়ানোর মত অর্থ নেই। ময়মনসিংহ রেল ষ্টেশনে আসে বাদল। টিকেট কাউন্টারে এসে সে মাস্টারকে বোঝানোর চেষ্টা করে তার কাছে কোন টাকা নেই। ঢাকা পর্যন্ত যাবার একটা ব্যবস্থা মাস্টার করতে পারে কি না। কোন কাজ হয় না। উপায়ান্তর না দেখে বাদল যাত্রীদের কয়েকটা ব্যাগ টেনে দেয়। ঢাকা পর্যন্ত আসার টাকাটা পেয়ে যায় সে।

১৩ বছর পর বাদল বাড়ী প্রবেশ করে। কাউকে দেখতে পায় না। কম্পিত গলায় মা মা বলে দু'বার শব্দ বের করে বাদল। সে না হয় ডাক, না হয় কান্না। দক্ষিণের ঘর খুলে ৩৫/৩৬ বছরের এক যুবক বের হয়। তপন। যুবক বাদলকে চিনতে পারে কি না বোঝা যায় না। বাদল তপনকে জিজ্ঞেস করে- মা কইরে, মা? যুবক কোন কথা বলে না। তপন, আমি বাদল! যুবক নিরুত্তর। এই কথোপকথনের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ এগিয়ে আসেন- আয়াজ চাচা। বাদল এগিয়ে গিয়ে সালাম করে চাচাকে। অনেক বছর পর বাদল কাউকে সালাম করল। চাচা বাদলকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কেঁদে ওঠেন। মা কই চাচা? উত্তর নেই, চাচার কান্না থামে না।

তপন দুটো চেয়ার এনে দু'জনকে বসতে দেয়। আয়াজ চাচা তপনকে চিঠির বাক্স আনতে বলে। তপন উঠে যায়। বাদল পাথরের মত বসে থাকে। সে কাঁদতে পারে না। মায়ের জন্য কাঁদবার অধিকারও সে হয়ত হারিয়েছে।

তপন একটা বাক্স নিয়ে আসে। বাক্স ভরা চিঠি। বাদলের চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে আসে। চোখ ঝাঁপসা হয়ে যায়, ভিজে যায় হাতে ধরা মার চিঠি। সে অশ্রু চিঠির অক্ষরে অক্ষরে মায়ের পরশ খোঁজে।

তপন বলে, মা তোমাকে প্রতি মাসেই হলের ঠিকানায় লিখতেন। আমিই তা পোষ্ট করে আসতাম। তারপর বছর দুয়েক আগে একটা ফেরৎ ডাক এল। একজন ছাত্র ৫১ টি চিঠি ফেরৎ পাঠিয়েছে আর লিখেছে বাদল নামে কেউ এখানে থাকেন না। এই খবরটি মাকে দেয়া হয়নি। এরপরও মা প্রতি মাসেই লিখতেন। আর আমি পোষ্ট করার নামে চিঠিগুলি আমার কাছেই রেখে দিতাম। তোমার চিঠির অপেক্ষা যেহেতু ছিল না, তাই এতে কোন প্রশ্ন ওঠেনি।

তপন নিজের মত করেই বলে যায়-তোমাকে মাগুরার গাড়ীতে তুলে দিয়ে বাড়ী ফিরে শুনি রওশন এসেছিল। রওশন শুনেছে এই বাড়ীতে গতকাল কমিউনিস্ট এসেছিল । কমিউনিস্ট যেন গ্রামে না ঢোকে এ বিষয়ে সে সবাইকে সাবধান করে দিয়ে গেছে। এর ৬ মাস পরে রওশন দীপাকে বিয়ের জন্য মায়ের কাছে প্রস্তাব পাঠায়। ভয়ও দেখায়। মা রাজী হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীপার ইচ্ছেতেই বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। বাদল অবাক হয় না।

তপন বললো, চলো কবরস্থানে যাই। বাদল কোন কথা বলে না। পাথরের মত বসে থাকে সে। আয়াজ চাচা তপনকে বাদলের খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। ২৫/২৬ বছরের একটি মেয়ে খাবার নিয়ে এল। বাদল বুঝতে পারে মেয়েটি তপনের স্ত্রী। বাদলের কিছু খাওয়া হল না। পোয়ার ব্যবস্থা হল তার।

মধ্যরাতে সবকিছু যখন নিঃস্তব্ধ তখন আবুল কাশেম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষিকা জায়মা রহিমের কবরের কাছ থেকে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসে। কবরের মাটিতে বার বার গড়াগড়ি খায় একটি দেহ। কারও চোখের পানিতে মাটি ভিজে তার দু'এক ফোঁটা পানি হয়ত জায়মা রহিমের অপার্থিব হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ভোর হয় একসময়, বাদলকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

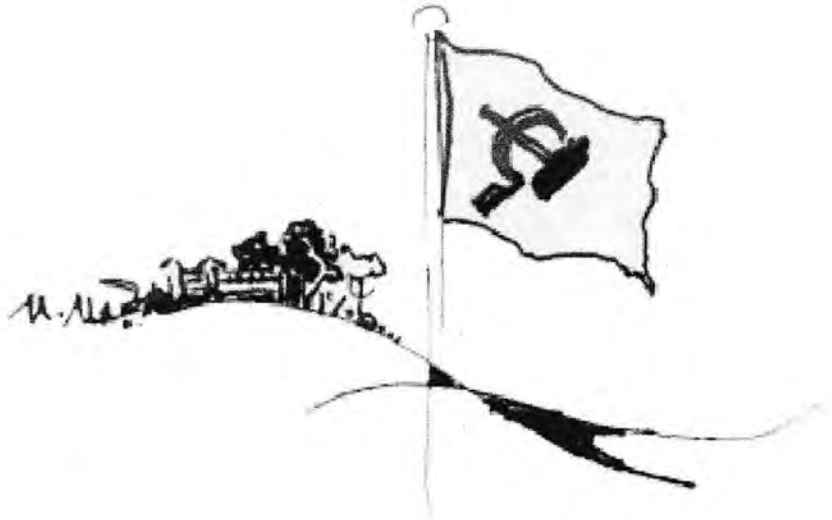

RMG in Bangladesh - Management

Mohammad Hasan
AGM, Babylon Group

The task of Management in all business and human organizations, simply put, is the act of getting people together to accomplish desired goals. Management does planning, organizing, staffing, leading or directing and controlling an organization.

Top Management:

The top layer of management holds ultimate power and sets strategy for the entire organization, which makes an organization effective and efficient. The top management is usually comprised of the stake holders and owners of the company who form the board of directors.

Mid-Management:

Middle management is a layer of management in an organization whose primary job responsibility is to implement top management decisions and allocate and monitor actions of floor level management. They report to top management.

Lower Management:

Performs direct supervisory roles, often with assigned responsibilities. They report to mid level managers.

We will now talk about the character of different layers of managements that exist in our RMG industry today.

Mid-Management:

Whenever a crisis arises involving unrests amongst workers in a factory the mid management is promptly blamed for that by everyone. Worker-management confrontations arising from reasons related to late disbursement of wages or any other grievances of the workers would be readily ascribed to the failure from the part of mid level managers. Whereas often these kinds of crises may originate more from lack of care and concern from the top management than so from the mid managers. Managers below the top management usually are not the authority to mitigate many reasonable demands from the workers. And since top management is often aloof from the day to day affairs of business in the shop floors they fail to take proper steps in good time to avoid crisis.

Before we make comments on the competency of the mid-level managers let's discuss the general background of this level of management in our garment factories. RMG is a labour

intensive industry. About 70% of the labours are females and they come from the homeless, landless poor class of the rural society of the country. Obviously rest of the workers are male and unfortunately they also share the same sorts of backgrounds as their female counterparts. To transform these generally illiterate and untrained workforces into trained and skilled ones requires quite a task from the part of the mid level managers.

Save a few exceptions majority of the existing production managers or factory managers do not have adequate educational background. They became managers by dint of their long tenure of services and because of the fact that this industry could hardly do anything to attract properly and adequately educated graduates from universities to work in garment factory floors.

Quality Control and Quality Assurance managers are no different from the production personnel. Most of them too lack proper training and education. Readymade garments are for exports and this business requires assurance of high level of quality in the merchandise to ensure better business share globally. In the garment industry quality control is required right from the initial stage of sourcing raw materials to the stage of finished garments. To understand wide and varying quality parameters and increasingly high demand of the customers the quality controllers and assurers need to be educated and trained accordingly. The importance of Human Resource Department (HRD) can hardly be exaggerated in a RMG production unit. This department is responsible for recruitment, training and compliance issues in a company. This very department too suffers from dearth of appropriately trained officers to deliver their job as situation demands. HRD professionals need to be educated and trained in aspects of human resource management.

Generally speaking the various departments functioning in apparel manufactories are ill equipped in terms of education, training and experience. As a result most of the factories run far below the optimum production levels. They suffer from low productivity, high defect rates, high absenteeism, high worker turnover, high wastage percentages etc.. Workers and supervisory force in those factories suffer from lack of direction and motivation.

Top Management in RMG Sector:

Many of the country's garment factories have been vandalized in the recent times and also in 2006. Apart from outside instigations there have been reports that the workers of the victim factories also took part in the gutting and looting of the factory properties. Experts opined that that was possible because RMG factories were rare where healthy inter worker-management relationship existed. Top management in factories generally maintains distance from the workers and would listen to the mid-management only for the happenings in the working place. They would usually believe in what they would be fed with by the production manager or the factory manager. That way they would often be misinformed and misled.

Recommendations:

Relatively RMG sector employees earn high salary and wages in our country. Managers in different layers and also supervisors working in garment factories earn more and attractive salaries compared to their competitors in other industries. This is also true for their earnings in relation with their educational qualifications. In this context it is possible to attract young people with higher educational backgrounds to this trade. Engineers and graduates from public and private universities can find their way to this sector for building their own carrier and as well as the development of the RMG industry. To meet the deficiency currently existing in this sector a few steps are urgently required. A) On-job mangers/ supervisors need to be trained adequately, B) Candidates from higher educational back grounds need to be recruited for the industry, C) Garment owners who act as the top management also need to be apprised of their role in managing, controlling and directing their factories. In order to train up their managers and staff and also to hire appropriate personnel they can engage both BGMEA and BKMEA and also BIFT (BGMEA Institute of Fashion & Technology).

A conscious and focused top management with proper business vision will always ensure a well-trained, educated and skilled factory management to perform in their factories for positive and satisfactory results. The infusion and assurance of a healthy management in our RMG manufacturing units can certainly improve their current performances by more than 50% without adding a single machine and an extra square foot to the existing facilities. Men behind machines and other resources have been the magic always.

"A COMPANY WITHOUT TECHNICAL PEOPLE IS LIKE
A HUMAN WITHOUT BACK SPINAL"

A Sweet Memory That Still Chymes

Sohely Suraiya Sadeque
Jr. Officer, Administration, Oven Tops

Once I became very sick and my doctor advised me to run a few pathological tests. So I took a short leave from my office and set off for Popular Diagnostics in Dhanmondi. My heart ached at the prospect of taking a bus ride to my destination. Commuting by bus had yet to come handy with me even though I had been residing in the city of Dhaka for quite sometime then. Those who hailed from small towns like I did probably faced the same problem coming to Dhaka.

Though I felt little helpless yet I finally made up my mind and left the office. I got into one of My Line buses that plies between Mirpur and Gulistan via Kalabagan, Science Lab etc. The bus was crowded as usual and the driver and the conductor were as rash as the others in this occupation. They drive their buses in a mad rush giving an air as if it was a prize competition they were racing for.

As the bus stopped at Kalabagan I alerted myself and was very careful not to miss my stoppage. I got little nervous as I was watching how difficult it had been for the other female passengers to alight from the bus at their destinations pushing their ways through the stubborn male crowd which thronged around the exit. On exasperation I requested the conductor to announce me my exit before the bus stops at the stoppage for Popular Diagnostics. He assured me of doing so while he was watching me with his curious eyes.

'You got to get down in the next stop if you want to go to Popular', said a young woman who was actually sitting in one of the front seats. She obviously overheard me when I was speaking to the bus conductor. 'I am going to Popular too' she said again. I did not say anything in response but followed her to get out of the bus.

'Come with me,' she said. I managed a 'Thank you' and started following her. As we walked I could see from the corner of my eye that she was in her early thirties and quite good looking in her near dark complexion. I was too shy to start a conversation. But she was not. She asked me why I wanted to go to Popular. What my problem was. Where I came from, etc. I could tell from the earnestness in her voice that she was not asking out of mere courtesy but from a genuine concern. I got little moved by her kindness and could not help telling her about my

problems in detail. By then we were in Popular center.

She asked for my name and then waved me to wait. Then she approached the reception and spoke to a girl there for about a minute. She returned to me and said, 'I have spoken to that girl in the reception about you. She will help you do your tests. Go and see her. By the way I am one of the Popular employees here.' She asked for my cell number and said she couldn't stay longer with me as she was already late. But she would check with me later on my cell number. And then she hurried away. I was so dazed that I forgot to ask her name even and to thank her for what she had done.

The girl in the reception helped me through the processes and told me I would be allowed a rare discount of 30% as advised by Liza Apu. So she was Liza! I thanked the girl and followed her instructions to get all my tests done. Suddenly everything turned out so easy and convenient for me! When I was almost through I got Liza Apu's call. She was asking me if everything went well. I wanted to tell her so many things. My voice was choked and words failed me. But she understood. She advised me about which bus I should avail on my way back and told me to be careful in the bus. My eyes moistened and I thought my own elder sister won't have treated me better.

The world around us in general is so cruel, ruthless and merciless that we often forget there are people who still roam the earth and can care for other people for selfless reasons. Liza Apu I adore you. May Allah bless you with all the good virtues and allow you a long life!

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

"ব্যাবিলন শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প"-এর আয়োজনে ২০০৮ এর S.S.C. পরীক্ষার দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন ডঃ মোজাফ্ফর আহমেদ

ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করছেন একজন কৃতি শিক্ষার্থী

ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস এবং সন্ধানীর আয়োজনে Blood Donation Camp - এ স্বেচ্ছায় রক্ত দান করছেন একজন ব্যাবিলনিয়ান

Blood Donation Camp-এর র‍্যালীতে সম্মানিত অতিথীবৃন্দের সাথে ব্যাবিলনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহন

TRENDZ-এর আয়োজনে দুস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

Babylon Group এর Fire Fighter দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠান সমূহ:

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ
- ব্যাবিলন ড্রেসেস লিঃ
- সুরভী গার্মেন্টস লিঃ
- অবনী ফ্যাশন্স লিঃ
- অবনী টেক্সটাইলস লিঃ
- অবনী নিটওয়্যার লিঃ
- জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিঃ
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিঃ
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিঃ
- ব্যাবিলন আউটফিট লিঃ (ট্রেন্ডজ)
- ব্যাবিলন প্রিন্টারস লিঃ
- ব্যাবিলন মেডিকেল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিক্স

প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানাঃ

২-বি/১, দারুস্সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ

টেলিফোন ঃ ৮০২৩৪৯৫-৬, ৮০২৩৪৬২-৩ (অফিস)
৯০০৭১৭৫, ৯০১০৫৩৩, ৮০১১০৮৯ (ফ্যাক্টরী),

ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮০৩২৯৪৯

ই-মেইল ঃ babylon@babylon-bd.com

ওয়েব ঃ www.babylongroup.com